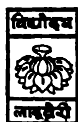
গিরিকন্যা

শিশির সরকার

Sarkar, Sisir



[illegible]দ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ● ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৪৪

প্রচ্ছদ
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ২.৫০ ন. প.

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান লেন কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

ক্রূর ভয়াল ও রহস্যময় এই বন্য পাহাড়ী জীবন দেখবার সুযোগ দিয়ে যাঁরা আমার এ গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের অন্যতম পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শ্রীকরকমলেষু

এক

ডুয়ার্সের একটি চা বাগান। হাঁ, চা বাগানটি বড়ই বটে। দার্জিলিং জেলার সীমান্ত ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে বাগানটি; তবে ভুটান সীমান্তও বেশী দূরে নয়। মেঘমুক্ত পরিষ্কার দিনে উত্তর-পূর্ব কোণে তাকালে ভুটানী পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি একটি একটি করে গোনা যায়।......বাগানের বড় সাহেব জাতিতে ইংরেজ এবং বেশ ভাল মানুষ। কিন্তু ছোট সাহেব জাতিতে স্কচ ও শয়তানের মত শঠ এবং, কুকুরের মত রিরংসু।

বীরেশ আজ দশ বছর হলো এ বাগানে এসেছে। পাঁচ বছর কাটিয়েছে বাগানেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে। দুই বছর কেটেছে এই বাগানের হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের পদে শিক্ষানবিসী করে। এক বছর বাগানেরই খরচে কলকাতায় কোন হাসপাতালে থেকে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। তারপর কম্পাউণ্ডারি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এই বাগানেই গত বৎসর থেকে পাকাপোক্ত কম্পাউণ্ডার হয়ে বসেছে। এতে কি তার উন্নতি হয়েছে? নিশ্চয়। ত্রিশ টাকার মাস্টারি ছেড়ে আজ সে পঞ্চাশ টাকার কম্পাউণ্ডার। আর্থিক দিক থেকে বিচার করলে আজ তার মাসে কুড়ি টাকা লাভ। অন্য লোক হলে এতেই পরিতৃপ্ত হতো। কিন্তু বীরেশের তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সব কাজেই তার কেমন যেন নির্লিপ্ততা। এ বাগানের অধিবাসীদের কারো সাথে তার এতটুকু সাদৃশ্য নেই। সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যেন কোন দূরদেশের রণক্লান্ত বিদ্রোহী সৈনিক এখানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছে। এই বাগানে এসে সে অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু শুনেছে এবং অনেক কিছু শিখেছে যা সে জীবনে আর কোথাও শিখতে পেত না—একথা ঠিক। তবু কর্ম-বিরল কত-না সন্ধ্যায় সে আতঙ্কিত হয়ে ভেবেছে—আর কিছুদিন এখানে থাকলে তার অন্তরতম প্রদেশে 'আমি' বলে যে ক্ষুদ্র প্রাণীটি এখনো মুমূর্ষুর মত ঝিমচ্ছে তার অপমৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তবু সে নিরুপায়। কারণ এই নিদারুণ বেকার সমস্যার যুগে তার এই সামান্য উপার্জনকে অবলম্বন করে একটি ক্ষুদ্র পরিবার নিভৃত পল্লীগ্রামে বেড়ে উঠেছে।

রাত্রি এগারটা। সারাটা দিন নিষ্কর্মার মত বসে থেকে হঠাৎ রাতে এমন কাজের চাপ পড়ে যাবে, বীরেশ এটা আশা করেনি। সন্ধ্যার সময় একটি ডেলিভারি কেস এসে হাজির হয়েছে। একটি নেপালী কুলির মেয়ে। মেয়েটি একটি মৃত শিশু প্রসব করেছে; কিন্তু প্রসূতির অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তারবাবু এইমাত্র রোগিনীকে দেখে গেছেন। 'কেস সিরিয়াস' বলে নার্সের সঙ্গে বীরেশেরও 'ডিউটি' পড়েছে।

এমন কন্‌কনে শীত পড়েছে যে বীরেশ তার 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' ওভারকোটটি গায়ে দিয়েও শীতে ঈষৎ কাঁপছে। সহসা তার দৃষ্টি পূর্ব দিগন্তে পড়লো।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। কি সুন্দর দৃশ্য। কি বিচিত্র স্নিগ্ধ রূপমাধুরী ওর কিরণে। বরফ-ঢাকা পর্বত চূড়ায়, বনে, প্রান্তরে ও গিরি-নির্ঝরে ওই আলো পড়ে এক নিগূঢ় মায়ালোকের সৃষ্টি করে চলেছে। বীরেশ স্বপ্নাতুর নয়নে চেয়ে থাকে ওই দিকে, যেখানে তুষার-ঢাকা-গিরি-চূড়া আর একখানি জলহারা টুক্‌রা মেঘ কানাকানি করছে। ওর মনে হয়, হাসপাতালের সমুখ পথ বেয়ে, মূর্তি নদীটির ধারে ধারে ঝাউ বীথিকার ভেতর দিয়ে, ওই ঝরনাটি ডাইনে রেখে, বনগহন পেরিয়ে ও ধরবে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা আঁকা-বাঁকা পথ। ওই পথ বেয়ে যেতে যেতে দূরে, অনেক দূরে, যেখানে আকাশের অসীম নীল এসে সীমাহীন তুষারে মিশে আছে—সেখানে সেই আলোর ঝিলিমিলিতে ও যদি যেতে পারতো! ও দেখতে পেত কত কিছু—কত অচেনা, কত অজানা ওই রহস্যের নিবিড়ে।

বহুদিন পর বীরেশের মাঝে আবার লুপ্ত সাহিত্যিক যেন সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠলো। ও তৃষাতুর নয়নে বরফ-ঢাকা গিরি শৃঙ্গগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উৎফুল্লভাবে বলে উঠলো—Such a night......Such a night—so mysterious—and wonderful.

এমন সময় অদূরে বড় সাহেবের গাড়ীর হর্নের শব্দ শোনা গেল। বীরেশ ত্রস্তভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বড় সাহেবের গাড়ী তীব্র গতিতে হাসপাতালের সম্মুখের পথ দিয়ে ছুটে কুঠির দিকে চলে গেল।

বীরেশ ক্ষণকাল বারান্দায় পায়চারি করে আবার চেয়ারে গিয়ে বসলো। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটি বের করে একটি সিগারেট ধরালো। খুব কয়েকবার ঘন ঘন টেনে একগাল ধোঁয়া মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে সে আবার আবেশ নিবিড় আঁখিতে দূরান্তরের তুষার-আবৃত গিরি-শিখরগুলির দিকে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে একটা স্বপ্নাবেশে সে ডুবে যেতে লাগলো।

সহসা একখানি স্নিগ্ধ শীতল হাতের স্পর্শে বীরেশ ফিরে তাকালো। দেখলো—

শায়লী। ও কখন যেন নার্সিংরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছে এবং তারই পিছনে চেয়ারের হাতলখানা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ওর পরনে ধবধবে ধোয়া মিহি আরামবাগী নীলপেড়ে খদ্দরের শাড়ী। ততোধিক শুভ্র নিজহাতে বোনা কালো বর্ডার দেওয়া ভূটানী উলের স্কার্প ওর গায়ে। শাড়ীখানা ওকে দিয়েছিল ওদের মেট্রন্ উর্মিলাদি ওর জন্মদিনে, শায়লী যখন ছিল চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নার্সের ট্রেনিঙে ; আর উল পাঠিয়েছিল ওর মামা ভূটান থেকে। হাসপাতালের অঙ্গন-উদ্যানে ফোটে অজস্র শ্বেত গোলাপ। সেই উদ্যান থেকে তোলা একটি বেশ বড় শ্বেত গোলাপ শায়লীর খোঁপায়। পায়ে সাদা রঙের হাইহিল। শায়লীর গৌরবর্ণ নাতিদীর্ঘ সুঠাম দেহ, তাতে ও পরেছে শ্বেত বসন। ওর রক্তিম কপোলে অনুলিপ্ত ঈষৎ ভ্যানিশিং ক্রিম। মৃদুমিষ্টি সুরভি ভেসে আসে ওর পুষ্পিত দেহ থেকে। এমন সরল সাজের এত বিরল সৌষ্ঠব বীরেশ জীবনে দেখেনি। এমন সাজও সাজতে পারে শায়লী—মন-ভ্রমর যেন আকৃষ্ট হয়। শহুরে মেয়েরাও সাজে, যে সজ্জা বসন, ভূষণ ও প্রসাধনের বাহুল্যে রূপকে আচ্ছন্ন করে। আর শায়লী সাজে, যে সজ্জা রূপকে প্রকাশ করে।…বীরেশ আবিষ্ট নয়নে শায়লীর দিকে চেয়ে থাকে। বীরেশের মনে হয়—ও যেন তুষারিকা, সদ্য ওই তুষারলোক থেকে নেমে এসেছে। ওর সর্বাঙ্গে তুষারের স্নিগ্ধ শীতল পেলবতা।

"কি ভাবছো এত, শায়লা দাজু ?" শায়লী মৃদু হেসে বললো।

"ভাবছি তোমাকে।" বীরেশ শান্ত কণ্ঠে বললো।

"এই, আবার তোমার দুষ্টুমি শুরু হলো বুঝি ? বাবা গো ! শুধু শুধু এমন মিছে কথাও বলতে পার তুমি।" শায়লী কপট রোষে বললো।

"এই দ্যাখো, তোমাকে নিয়ে কি যে মুশকিলেই পড়েছি আমি, তা আর কি বলবো। আমি যখন খাঁটি সত্য কথা বলি, তুমি তখন ভাব আমি মিথ্যে কথা বলছি ; আর আমি যখন ডাহা মিছে কথা কই, তুমি ভাব আমি সত্যি কথা কইছি।—হা হতোস্মি ! একেই বলে ললাটের লিখন।"—বীরেশ এমন ভাবে কপালে করাঘাত করলো যে শায়লী খিল খিল করে হেসে উঠলো।

"আচ্ছা, আমি তো অল্পক্ষণ হলো এখানে এসেছি। আর তুমি সেই দশটা থেকে বারটা অবধি ঠায় এখানে বসে বসে কি যে করছো, কি বা দেখছো—তা ভগবানই জানেন। আচ্ছা, বলো দেখি সত্যি করে এতক্ষণ চুপটি করে বসে বসে কি ভাবছিলে, শায়লা দাজু ?" শায়লী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

"সত্যি করে বলতে হবে ?" বীরেশ অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গী করে বললো।

"নিশ্চয়ই।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

"কিন্তু একটি শর্তে—আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আর আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।" বীরেশ বললো।

"আচ্ছা, তাই হবে।" শায়লী বললো।

বীরেশ সকৌতুকে বলতে শুরু করলো, "১ নম্বর কর্মের মধ্যে করছিলাম ধূমপান। ২ নম্বর কর্মের মধ্যে দেখছিলাম, অদূরে বরফ-ঢাকা হিমালয়ের চূড়াগুলি, যেখানে চাঁদের আলো অঝোরে ঝরে পড়ছে, সৃষ্টি করছে এক রংস্ত নিবিড় মায়ালোক—যা চাঁদের মায়া দিয়ে তৈরী আর চন্দ্রমায়ার সুষমায় ঢাকা। ওই উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন-করা অস্পষ্ট দূরলোকের দিকে প্রীতিস্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে আমি স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই ভাবনা আমায় পেয়ে বসলো—আমি যেন অচিন দেশের এক রাজপুত্র। ওই দূরলোকের সুরের ইন্দ্রজাল যেন চঞ্চল করে তুলেছে আমায়। আমি ছুটে চলেছি আমার সামনের উদাস-করা পথ বেয়ে আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে—ওই চন্দ্রালোকিতাদের দেশে। পক্ষীরাজ ছুটে চলেছে কত নদী পেরিয়ে, গিরি নির্ঝর ডিঙিয়ে, পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে বায়ুবেগে; ছুটছে-না ছুটছে, পথের যেন শেষ নেই, অন্তহীন সেই পথ।—ওমা, একি! এরই মধ্যে আমার পক্ষীরাজ পাহাড়ের চূড়ায় হোঁচট খেয়ে একেবারে ভূতলশায়ী।

অতি দুঃখে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি—একি! এ যে তুমি! কুহেলিকা নয়—কুহকিনী নয়—একেবারে রক্তমাংসের শরীরে বর্তমান 'চন্দ্রমায়া'! আমার পিছনে, আমারই চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে! যে চন্দ্রমায়ার পিছু এখনি ছুটে ছুটে মরছিলাম, এ যেন সেই মায়ালোক থেকে ঠিক্‌রে পড়া একটুখানি ওই চাঁদেরই মায়া—বনগহন এদেশের বুকে যেন এক টুকরা অম্লান বন-জ্যোৎস্না।"

বীরেশ মৃদু হেসে শায়লীর মুখের পানে তাকালো।

শায়লী হাসতে হাসতে বীরেশের পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়লো। তারপর হাসির বেগ কতকটা প্রশমিত হলে ও বললো, "বাবা গো! এত কথা তুমি জান—একেবারে কথার আতসবাজি। আচ্ছা, শায়লা দাজু, এ রকম মিথ্যে কথার মালা গাঁথতে তোমার ক্লান্তি বোধ হয় না?"

"মিথ্যে নয় বলেই তো ক্লান্তি নেই। মিছে কথা হলে নিশ্চয়ই ক্লান্তি বোধ হতো।" বীরেশ তেমনি হেসে বললো।

"তোমার কথাগুলো স্থানে স্থানে এত হেঁয়ালি ও এত মধুর যে কবিতা বলে ভ্রম হয়—এ যেন নিঃসীম নীলিমায় ভেসে যাওয়া এক টুকরা জলহীন মেঘ, যা কেবল

পিপাসা বাড়ায়, পিপাসা মেটায় না।" শায়লী কথাগুলি বলে হাসিমুখে বীরেশের দিকে চাইলো।

বীরেশ মুগ্ধ নয়নে শায়লীর দিকে তাকালো। এ কি শায়লীর কথা, না—শায়লীর মুখে থেকে বেরিয়ে এলো তারই মুখের কলরব!

সেদিনের সেই শায়লীকে কি আজ চেনা যায়? বীরেশ কল্পনার নেত্রে পিছনের পানে ফিরে তাকায়—দূরে বহুদূরে আজ থেকে দশ বৎসরের অপর প্রান্তে হারিয়ে-যাওয়া শায়লীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনগুলি—জীবনের আবছায়া খাপছাড়া দিনগুলি। সেদিনের নেপালী নাকছাবি-পরা বিরলভূষণা, মলিনবসনা, নেপালী মেয়ে শায়লী। আজ কি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় এই শায়লীর মাঝে? এ যেন শাঙনের গাঙে নির্ঝরিণীকে খুঁজতে আসা। তবু বীরেশ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শায়লীর মুখখানির দিকে, যেখানে এখনো আছে ঈষৎ অনুন্নত নাসিকাটিকে ঘিরে দ্রুত বিলীয়মান একটুখানি বন্যশ্রী ওর স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে।

ক্ষণকাল চুপ করে বসে থেকে বীরেশ বললো, "তবে আর কি করি বলো? তুমি যখন আমার সব কথায়ই অভিনয় দেখ, তখন আমার অভিনয় ছাড়া উপায় তো দেখিনে।"

"তাই ভাল শায়লা দাজু! তাতে আর যাই হোক, কারো অভিযোগ করার কিছু থাকবে না। মানুষের আপত্তি সেইখানে যেখানে মিথ্যা সত্যের রূপ ধরে আপনাকে সত্য বলে জাহির করে। কারণ মিথ্যা যত মোহিনীই হোক তাকে মিথ্যা বলে জানতে পারলে তা মানুষের চিত্ত-বিভ্রম ঘটায় না। তাই আমরা অভিনয় দেখে কখনো পাগল হয়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পিছু ছুটি না।" শায়লী শান্ত কণ্ঠে বলে বীরেশের দিকে তাকালো।

"আমরা তাও কিছুটা ছুটি বৈকি। শোনা যায়, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি একদিন থিয়েটার দেখতে দেখতে এতটা আত্মহারা হয়েছিলেন যে, একটা অভিনয়কে তিনি অভিনয়-নয় বলে ভুল করলেন; এবং তার ফলে একজন ভাগ্যবান অভিনেতা পেলেন একখানি জুতা উপহার।" বীরেশ মৃদু হেসে থামলো।

"তাই নাকি?" শায়লীও হাসিতে যোগ দিলো।

তারপর ও হাসতে হাসতে বললো, "তা বাপু, যাই বলো, আমরা প্রাতঃস্মরণীয়ও নই আর মহাত্মাও নই, তাই আমাদের ওরকম মহান্ উপহার দেবার দুঃসাহস নেই। আমরা অতি সাধারণ গ্রামের মেয়ে, আমাদের সামান্য উপহার একটি ফুলের মালা—না হয় সেই দিনের আশায় গেঁথে রাখবো, যেদিন তোমার এ অভিনয় অভিনয়-নয় হয়ে

দেখা দেবে।" শায়লী হাসতে হাসতে থামলো। এমন সময় রোগিনীর রুম থেকে একটি কাতর গোঙানির শব্দ শোনা গেল। শায়লী দ্রুতপদে রোগিনীর রুমে গিয়ে ঢুকলো।

সেদিনের শায়লী—তার হাতে-গড়া শায়লী, সেও আজ কথা বলতে শিখেছে—অতি সুন্দর কথা—প্রাণের নিগূঢ় ইশারা-ভরা।

সাফল্যের আনন্দে বিভোর দুই চোখে বীরেশ চেয়ে রইল সেই পথপানে, যে পথে শায়লী চলে গেল এখনি।

গিরিকন্যা

দুই

বীরেশ যেমন নার্সকে 'শায়লী' বলে ডাকে, তেমন নার্সও স্থানবিশেষে বীরেশকে কখনও 'শায়লা বাবু', কখনো বা 'শায়লা দাজু' বলে ডেকে থাকে; অর্থাৎ অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে শায়লী বীরেশকে 'শায়লা বাবু' বলে, আর একান্ত পরিচিত পরিজনের নিকটে 'শায়লা দাজু' বলেই ডাকে। নেপালী ভাষায় 'দাজু' শব্দের অর্থ হলো দাদা। এদের দুইজনের এই নামকরণ এদের জন্মের একটি মিলের পরিচয় দেয়। বীরেশের নাম রেখেছে 'শায়লা' শায়লীর পিতা রামচন্দ্র ছত্রী। কারণ বীরেশ তার পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। নেপালী ভাষায় তৃতীয় পুত্রকে 'শায়লা' বলে। নার্সও তার পিতামাতার তৃতীয় কন্যা। তাই তাকে সকলে 'শায়লী' বলে ডাকে। শায়লীর ভাল নাম—যাকে নেপালী ভাষায় জন্ম-নাম বলে—হলো 'চন্দ্রমায়া'। নেপালীরা গৃহে তাদের ছেলেমেয়েদের সাধারণতঃ জন্ম-নাম ধরে ডাকে না। জন্মের ক্রম অনুসারে ডাকা নেপালী সমাজে নামের স্থান অধিকার করে আছে।

শায়লী নার্সের কাজে এই বাগানের হাসপাতালে এক বৎসর শিক্ষানবিসী করেছে। তারপর দুই বৎসর ছিল কলকাতায় বাগানেরই খরচে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ট্রেনিংে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে নার্সের পরীক্ষা পাস করে এই বাগানেই আবার ফিরে এসেছে সেই নার্সের কাজে। পূর্বের সম্বন্ধ ধরে বিচার করলে শায়লী বীরেশের ছাত্রী। কিন্তু আজ ভাগ্যক্রমে ছাত্রী তার সহকর্মীর পদ অধিকার করেছে। এতে বীরেশ বরং খুশীই হয়েছে। শতকরা নিরানব্বইটি নেপালী মেয়ের কপালে যা ঘটে থাকে, বীরেশের একটি ছাত্রীর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম ঘটলো। এতে বীরেশই সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ পায়। আজ হতে দশ বছর আগে যখন বীরেশ এ বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসে, তখন বারো বছরের এই পাহাড়ী মেয়েটিকে সে বাঙালী ইস্কুলে দেখতে পায়। বাগানের অপর প্রান্তে একটি পাহাড়ী ইস্কুল থাকতে মেয়েটি কেন বাঙালী স্কুলে এলো? কৌতূহলের বশে মেয়েটিকে কাছে ডেকে বীরেশ তার পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখলো—বইগুলি সবই বাংলা। বীরেশ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, "খুকী, পাহাড়ী ইস্কুল ছেড়ে বাঙালী ইস্কুলে কেন এসেছ?"

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় উত্তর দিয়েছিল, সে ইংরাজী শিখতে বাঙালী ইস্কুলে এসেছে। প্রাইমারী ইস্কুলে ইংরাজী শিখতে এসেছে শুনে বীরেশ বারেক হেসেছিলো মাত্র। কিন্তু তবু পাহাড়ী মেয়ের এই উদ্যমকে সে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারেনি।…

যথাসময়ে শায়লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে পেয়েছিলো বৃত্তি। কিন্তু পারিবারিক বাধা তার উচ্চ শিক্ষার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। শায়লী কিন্তু দমলো না—দুর্দমনীয় ওর অধ্যবসায়। অবসরের ফাঁকে ফাঁকে শায়লী পড়তে লাগলো বীরেশের কাছে M. E. পরীক্ষা দেবার পাঠ্য বিষয়গুলি, অবশ্য বিনা বেতনে। উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাকুল আগ্রহবতী একটি ছাত্রীকে সামান্য কয়েকটি রজত খণ্ডের জন্য নিরাশ করার মত পাকা ব্যবসাদার শিক্ষক বীরেশ কখনো হতে পারেনি। শায়লী তাই পাস করলো M. E. পরীক্ষা প্রথম বিভাগে—অবশ্য সামান্য কয়েকটি নম্বর কম থাকায় বৃত্তি থেকে হলো বঞ্চিত। পাহাড়ী মেয়ের অভাবনীয় সাফল্যে বীরেশ হলো মুগ্ধ।

এস্থানের অনেক ছেলেমেয়ে—বিশেষ করে পাহাড়ী—'গ্রেহামস্‌হোম'-এ থেকে পড়াশুনা করে। বীরেশ শায়লীর পিতা রামচন্দ্রকে অনেক বুঝিয়ে শায়লীকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলো ওই 'গ্রেহামস্‌হোম'-এ। রামচন্দ্র তার পরম উপদেষ্টা ডাক্তারবাবুর সাথে পরামর্শ করে বীরেশের কথায় সম্মত হলো।…শায়লীর ভাগ্যের আকাশে যেন উষার অরুণিমা দেখা দিলো। বীরেশের উপর ভার দেওয়া হল—সে-ই গিয়ে শায়লীকে ভর্তি করে দিয়ে আসবে 'গ্রেহামস্‌হোম'-এ। হলোও তাই। কেটে গেল একটি একটি করে প্রায় তিনটি বছর—শায়লীর কাছে তিনটি সোনার যুগ।

সহসা হলো ওই আকাশ থেকেই বজ্রপাত, যেদিন শোনা গেল পাশের বাগানের পাহাড়ী মুন্সী রবিলাল গুরুঙের ছেলে ডিগ্‌বীর গুরুঙ্‌ নাকি হয়েছে খৃষ্টান। সে-ও ওই হোমেই থেকে পড়াশুনা করতো।—আর কি! রামচন্দ্র ভয় পেল। এমন ভয় পেল যেন সেই দিনই তার মেয়েকে ওই হোম থেকে না আনলে তার মেয়ের হবে অপমৃত্যু। বীরেশ অনেক বুঝালো ;—পাহাড়ী গোঁ, কিছুতেই কিছু হলো না।…শায়লী ঘরে ফিরে এল জীবনের ব্যর্থ অসমাপ্তি নিয়ে।…

ঘরে বসে ও কয়েকদিন কাঁদলো। কিন্তু মানুষ কতদিন বা কাঁদতে পারে? ধীরে ধীরে ওর চোখের জল শুকিয়ে এল, ও আবার এল বাইরে।

এমন সময় কোম্পানীর হেড অফিস একটি সেন্‌ট্রাল হাসপাতালের ব্যয় মঞ্জুর করে পাঠালেন। এই কোম্পানীর পাঁচটি বাগান; তার কেন্দ্রীয় হাসপাতালের স্থান নির্বাচিত হলো শায়লীদের বাগানেই। এখন চাই পাসকরা কমপাউণ্ডার এবং

ট্রেনিঙপ্রাপ্ত নার্স। ডাক্তারবাবু রামচন্দ্রের সঙ্গে যুক্তি করে শায়লীকে এই কাজ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। শায়লী প্রথমে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু বীরেশ অনেক করে বুঝিয়ে ওকে সম্মত করায়। সেই থেকে শায়লী এই হাসপাতালের নার্স, আর বীরেশ কম্পাউণ্ডার—পরস্পর সহযোগী।···শায়লীর জীবনের গতি-পথের কি এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ?—না। ও যেন প্রমত্তা তটিনী—বাধা ও বন্ধনে যা স্তব্ধ হয়ে যায় না—জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যার বিচিত্র প্রবাহ আরো স্ফীত ও ফেনিল হয়ে ছুটে চলে।

নার্সের কাজের বিরল অবকাশে শায়লী আবার পড়া শুরু করলো। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে ও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। শিক্ষক চিরকালের সেই বীরেশ—ওর সাধনার উত্তরসাধক। শায়লী 'গ্রেহামস্‌হোম'-এ মিশনারী মেম সাহেবদের সাথে থেকে থেকে তিন বৎসরে ইংরাজী মোটামুটি মন্দ শেখেনি। আরো কিছুদিন থাকতে পারলে ও 'জুনিয়র কেমব্রীজ' পরীক্ষা দিতে পারতো। প্রতিভা যদি অধ্যবসায় এবং তার কষ্ট সইবার অপরাজেয় ক্ষমতা হয়, তবে শায়লী নিশ্চয়ই প্রতিভাবতী। ওর সহজাত পাহাড়ী গোঁর সাথে মিলেছে অনন্য মন। ও যা ধরে তা শেষ না করে ছাড়ে না। ওর প্রতিভার ভাতি যেন টর্চের কেন্দ্রীভূত আলো, যা বাধা বিঘ্নের ঘন অন্ধকার ভেদ করে নিজের পথ করে চলে।

এই সেদিন—ও যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ট্রেনিঙে ছিল। ওদের উর্মিলাদি করেন ভাল কীর্তন গান। ওই কীর্তন গান শেখার জন্য শায়লীর রোখ চাপলো। আর যাবে কোথায়!—সৌভাগ্যক্রমে বীরেশ তখন ছিল কলকাতায়। সেইদিনই বীরেশকে দিয়ে হারমোনিয়াম কিনে আনা হলো। বাগানে বীরেশের একটা পুরানো হারমোনিয়াম ছিল। বীরেশ সাধারণ বাংলা গান মোটামুটি ভালই গায়। কলেজী জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলে তার একটু নামও ছিল। বাগানের শ্বাস-রোধ করা আবহাওয়ায় তার হৃদয় যখন অশান্ত হয়ে উঠতো, তখন সে তার আপন ঘরে বসে হারমোনিয়ামটি নিয়ে তার দুঃখের রাগিনীকে গানের ভেলায় ভাসিয়ে দিত।···শায়লী গান-ও শিখেছিল ওই বীরেশের কাছে—যে ওর সকল সাধের সাধক।

যেমন শিখে থাকে ছোট শহরে সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়েরা। ইতিমধ্যে ও যখন ছিল 'গ্রাহামস্‌হোম'-এ মিশনারী মেমসাহেবদের কাছে ও শিখেছিলো কয়েকখানা ইংরাজী প্রার্থনা গান আর গুটিকয়েক সাধারণ ইংরাজী গান। মোটকথা গানের জগতে শায়লী নবাগতা নয়। তা হলে কি হবে! কীর্তন গান—ওই উর্মিলাদির মত কীর্তন গান তাকে শিখতেই হবে। তাই বীরেশ যখন বললো যে, সে বাগানে

গিয়ে তার হারমোনিয়ামটা পাঠিয়ে দেবে, শায়লীর ততদিনের তর সইলো না। শায়লীর এবার হলো নিজস্ব হারমোনিয়াম। চললো গান দুয়ার বন্ধ করে কাজের ফাঁকে ফাঁকে—দিন আর রাত। ছাত্রীর দাপটে শিক্ষয়িত্রীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। উর্মিলাদিরও ঘর ছেড়ে পালাই-পালাই ভাব। কিন্তু হলে কি হবে? শায়লী যখন এসে হাসিমুখে উর্মিলাদির হাত-ধরে বলে, "একটুখানি আসুন উর্মিলাদি আমার ঘরে।" তখন কার সাধ্য না ওঠে! ওই বন্য পাহাড়ী মেয়ের মধ্যে এমনি একটি অনন্য মোহিনী শক্তি আছে যা মনকে মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আকর্ষণ করে।

শায়লী শুধু কয়েকখানি কীর্তন গানই শেখেনি, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর বই কিনে বইগুলি প্রায় আধাআধি মুখস্থ করে ফেলেছে। ওর গান শুনে যদি কেউ মুগ্ধ না-ও হয়, তবু এটা বেশ জোর করে বলা যেতে পারে যে, কেউ অন্তত বিরক্ত হবে না।

শায়লী ইতিমধ্যে রোগিনীর তদারক শেষ করে আবার বীরেশের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো। বীরেশ তেমনিভাবে বসে আছে চেয়ারে, ওই আকাশের দিকে চেয়ে। শায়লীকে হঠাৎ কৌতুকের নেশায় পেয়ে বসলো। ও বীরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "শায়লা দাজু গো—ও!"

বীরেশ চমকে উঠে ফিরে তাকালো এবং মৃদু হেসে বললো, "ও মায়া?—না না, চন্দ্রমায়া!"

উত্তর শুনে শায়লী হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো। বীরেশও অপ্রতিভভাবে সেই হাসিতে যোগ দিলো।

"শায়লা দাজু, সারজার লাগদেইছ। আলিক তাতপানি পায়ভনে রাম্রো হুঞ্চ।"* শায়লী সহসা নেপালী ভাষায় কথাগুলি বলে তার হাতের তালু দুখানা সজোরে পরস্পরের সঙ্গে ঘষে তার সুন্দর মুখখানার উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলো।

"তাত পানি মের পাশ ছৈনা। তাত দাওয়াই মের পাশ ছ। খায় ভনে দিন্নু শকৃছু।"† বীরেশও নেপালী ভাষায় জবাব দিলো এবং আলমারি খুলে 'ভাইনাম গেলেসিয়ার' শিশিটা বের করলো।

"ধেৎ! কি দুষ্টু!" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় শায়লী বললো।

"কেন শায়লী?" বীরেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শায়লীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

---

* বাংলা—শায়লা দাজু, খুব শীত লাগছে। কিছু গরম জল অর্থাৎ চা পেলে ভাল হতো।

† বাংলা—আমার কাছে গরম জল নেই। গরম ঔষধ আমার কাছে আছে। খেতে চাও দিতে পারি।

"কেন? আমি কি নেশাখোর নাকি যে, আমায় মদের বোতল দেখিয়ে বাজারের মেয়েমানুষের মত অপমান করছো?" রাগে ও অভিমানে শায়লীর গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছিলো।

বীরেশ চমৎকৃত হয়ে শায়লীর মুখের দিকে তাকালো। একটা সফলতার আত্ম-প্রসাদে তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এত দিনে সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে, একটি পাহাড়ী মেয়েকে তার দীর্ঘ দিনের শিক্ষাদান আজ সার্থক হয়েছে।

একটা ঢোক গিলে তার অপরাধকে লঘু প্রতিপন্ন করার জন্য বীরেশ বললো, "এতে দোষ কি, শায়লী? সেদিনও তোমার দিদি, তোমার মা আমার কাছ থেকে এই 'ভাইনাম গেলেসিয়াই' চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। আর এই বাগানের নেপালী ছেলেমেয়ে—সকলেই তো কমবেশী নেশা করে থাকে।"

"করুক্। আমি আমার দিদি নই—আমি আমার মা নই—আমি নেপালী নই—আমি এ বাগানের ছেলেমেয়ে নই—আমি এখানকার কেউ না।" শায়লী রাগে ও অভিমানে চীৎকার করে উঠলো।

"তবে তুমি কি?" বীরেশ ঠাট্টামেশানো সুরে বললো।

"আমি, আমি, আমি—" শায়লী চট্ করে কোন সঠিক জবাব দিতে না পেরে গভীর উত্তেজনায় থেমে গেল।

"তুমি বাঙালী?" এবারও বীরেশ আগের মত সকৌতুকে বললো। মরুর বুকে শায়লী হঠাৎ যেন কল্লোলধ্বনি শুনতে পেলো। এই বীরেশের কাছে বসে ও পড়েছিল একদিন—'যাহারা বাঙলা দেশে জন্মিয়াছে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহারাই বাঙালী।' শায়লীও মনে মনে ভাবতে লাগলো, তবে সেই বা কেন বাঙালী বলে পরিচয় দিতে পারবে না? সেও বাঙলা দেশেই জন্মেছে এবং বাংলা পড়তে, লিখতে ও বলতে পারে।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি বাঙালী। কোন্ দোষে আমি বাঙলার মেয়ে হতে পারবো না? আমি বাঙলার মাটিতে জন্মেছি, আমি বাংলা লিখতে পারি, সবার উপর—আমি বাঙলা দেশকে ভালবাসি। শায়লা দাজু, তুমি আমাদের ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়িয়েছিলে, তা কি আজ সব ভুলে গেলে?" দুঃখে ও অভিমানে শায়লীর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠলো। বীরেশ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটি পাহাড়ী মেয়ে তাকে আজ এমন করে বাঙালী জাতির সংজ্ঞা বুঝাতে পারবে, এটা তার ধারণার অতীত ছিল। এই বাগানে এত সব বাঙালী বাবুদের মেয়েরা আছে। আজ তাদের কাউকে যদি এ প্রশ্ন করা যেত, তাহলে—বীরেশের বিশ্বাস—কেউ অমন সুন্দরভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো কিনা সন্দেহ।

ধীরে ধীরে শায়লীর ক্ষোভ ও অভিমানের রেশ অনেকটা প্রশমিত হয়ে এলো। সে দুয়ারের চৌকাঠে হেলান দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দূর অরণ্যানীর দিকে চেয়ে রইলো।

বীরেশ শান্তকণ্ঠে ডাকলো, "শায়লী!"

"বল।" ব্যথাতুর স্বরে উত্তর দিলো শায়লী।

"শায়লী, আজ আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি প্রকৃতই বাঙলার মেয়ে। তোমার মত খাঁটি বাঙালী সারা বাগানটার ভেতর একজনও নেই। আমি তোমার শিক্ষক। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, তুমি তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এমনি খাঁটি বাঙলার মেয়েই যেন থাকতে পার।' ধীরে ধীরে বীরেশ তার ডান হাতখানি শায়লীর মাথার উপর রাখলো।

শায়লী নতজানু হয়ে-বীরেশকে প্রণাম করলো। একটা মধুর নীরবতা তাদের মাঝে নিবিড় হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শায়লী ছুটে বেরিয়ে গেল।

বীরেশ ডাকলো, "শায়লী, কোথায় যাচ্ছ?"

"জান তো নেপালী মেয়েদের নেশা না হলে চলে না। তাই যাচ্ছি নেশার খোঁজে।" মুচকি হেসে শায়লী যেতে যেতে জবাব দিলো।

তিন

বীরেশ আবার চিন্তার সাগরে ডুবে গেল।

এই বাগানে সে আজ দশ বৎসর ধরে রয়েছে, কিন্তু গড়ে সে দশটি দিনও আনন্দে কাটাতে পারেনি। দশটি বৎসর তার কাছে যেন দশটি যুগ। আর কতদিন যে এখানে তার থাকতে হবে তাও সে জানে না। কিন্তু তার প্রাণ এখানে আর একটি দিনও থাকতে চায় না।

ধীরে ধীরে তার ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়লো। সে ছাত্র কোন দিনই খারাপ ছিল না। কলেজের পত্রিকা সমৃদ্ধ হতো তার কবিতা-প্রবন্ধে। কলকাতার ছোটখাটো দুই একখানা মাসিকেও তার লেখা কেবল প্রকাশিত হতে শুরুও হয়েছিল। কলেজে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অনেকে তাকে কবিবর বলে ডাকতো। শুধু কি তাই? কলেজের অধ্যাপকেরাও চিরদিনই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করতেন। বীরেশ কোনদিন তার পড়ার খরচ বাবদ বাড়ী হতে একটি কানাকড়িও পায়নি। সেও কোনদিন তার প্রত্যাশা করেনি। পরের বাড়ীতে খেয়ে পরের ছেলে পড়িয়ে সে পাস করেছিল 'ইন্‌টারমিডিয়েট্' প্রথম বিভাগেই। কিন্তু তবু তার বি. এ. পড়া হলো না। হঠাৎ একটা প্রবল ভূমিকম্পে যেন তার জীবনের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। তার পিতার অকাল মৃত্যুর পর তাদের সংসারটি সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ের ভূতের মত তার কাঁধে চেপে বসলো। যার ফলে সে ভাগ্য-অন্বেষণে আজ একেবারে ভুটানের সীমান্তে এসে পড়েছে। আজও পিছন ফিরে তাকালে যৌবনের প্রথম স্বপ্ন-দিয়ে-মাখা সেই পুরানো দিনগুলি বীরেশের চোখের সামনে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে।

তবু নিরাশার এই গাঢ় অন্ধকারে একটুখানি আশার রশ্মি ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। সেই আলোর বর্তিকা হলো বীরেশের বিধবা বোন মীরা। সে মাতুলালয়ে থেকে পড়ছে। এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে। টেষ্টে সে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। বীরেশের খুব আশা, মীরা এবার পাস করবে এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই। মীরা পাস করলে বীরেশ আর কিছুতেই এ বাগানে থাকবে না। অন্য কোন প্রকার ভাগ্য পরীক্ষায় বের হবে।

বাস্তবিক মানুষ যে এমন করে আত্মবিক্রয় করতে পারে, তা এখানে না এলে

বীরেশ কিছুতেই জানতে পেত না। এই বাগানে মানুষের প্রেতপুরীর মাঝে একমাত্র পাহাড়ী মেয়ে শায়লীকেই তার সজীব মানুষ বলে মনে হয়। শায়লী রূপসী। চা বাগানের কুলী কিংবা কুলীর সর্দারের মেয়ের রূপ থাকা অভিশাপ। কিন্তু তবু শায়লী সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে নিজের দেহকে নিষ্কলঙ্ক রেখেছে। এ কথা বীরেশ যতই ভাবতে থাকে, ততই শায়লীর প্রতি সে কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করে।

''শায়লা দাজু!'' শায়লী মন্থর পদে চায়ের কাপ হাতে করে বীরেশের পাশে এসে দাঁড়ালো।

"বাঃ, চমৎকার! এত অল্প সময়ে, এই সময়ে, এই হাসপাতালে এসব কোথা থেকে জোগাড় করলে, শায়লী?"—বিস্ময়-ভরা চোখে বীরেশ শায়লীর দিকে তাকালো।

''তা তুমি বুঝতে পারবে না, শায়লা দাজু! একমাত্র নেশাখোর নেপালী মেয়েরা এসব বুঝতে পারে। কিন্তু আমার আশা আছে, আরো কিছুদিন তোমাকে এই নেপালী মেয়ের সাথে রাখতে পারলে তুমিও একজন পাকা নেশাখোর হয়ে যাবে।" ফিক্ করে হেসে শায়লী মুখ ঘুরালো।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বীরেশের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটা ক্ষীণ প্রয়াস দেখা দিলো। পরে শীত-শিথিল হাতে সে পকেট হতে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলো। একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বীরেশ বললো, "তোমার সাথে আরো কিছুদিন থাকার প্রয়োজন হবে না, শায়লী। আমি এখনি দস্তুর মত নেশাখোর। এই দেখ-না, কেমন প্যাকেটে প্যাকেটে সিগারেট খাই। তুমি একটা সিগারেট খাবে?" স্মিত মুখে বীরেশ একটি সিগারেট শায়লীর দিকে উঁচু করে ধরলো।

"যাও, তোমার আবার ফাজলামো শুরু হলো বুঝি?" শায়লী ঈষৎ রুষ্ট হয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল।

বীরেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। তার হিম-শীতল দেহের ভিতর দিয়ে একটি সতেজ শিহরণ প্রবাহিত হতে লাগলো। সে হাতের জলন্ত সিগারেটটিতে একটি সজোরে টান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে দিলো। বীরেশ ধীরে ধীরে পেয়ালাটিতে আবার একটি চুমুক দিলো। ক্রমে ক্রমে একটা ভাব-বিহ্বল আবেশ যেন তাকে ঘিরে ধরলো। বীরেশ মদির নয়নে বনান্তরের গিরিশ্রেণীর দিকে রইল চেয়ে, যেখানে চন্দ্রালোক নব নব স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করে চলেছে।

"শায়লী।" বীরেশ আনমনে একবার ডাকলো।

"এই আসছি, দাজু!" ঘরের ভেতর হতে শায়লীর উত্তর এলো। বাকি চাটুকু এক চুমুকে শেষ করে শায়লী বীরেশের পাশে এসে দাঁড়ালো।

"ডাকছো, শায়লা দাজু?" মমতা বিজড়িত কণ্ঠে শায়লী বললো।

"হ্যাঁ।" বীরেশ বললো।

"কেন?" শায়লী প্রশ্ন করলো।

"এমনি ডাকলাম। একা একা ভাল লাগছে না, বোন! ওই চেয়ারখানা এখানে টেনে একটু বস-না, কিছুক্ষণ গল্প করে কাটানো যাক।" বীরেশ আঙুল দিয়ে চেয়ারখানি দেখিয়ে দিলো।

শায়লী বীরেশকে অনেক দিন থেকেই 'দাজু' বলে ডাকে; কিন্তু বীরেশ আজই প্রথম শায়লীকে তার ভগ্নীর আসনে বসালো। বীরেশের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা ছোট একটি কথা 'বোন' শায়লীর কানের ভেতর দিয়ে যেন মর্মে প্রবেশ করলো। ওর সর্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। হর্ষবিবশ লোচনে শায়লী বীরেশের দিকে চেয়ে রইলো।

"শায়লী, রোগিনী কেমন আছে?" চায়ের কাপে আবার একটি চুমুক দিয়ে বীরেশ বললো।

"বেশ ভাল আছে—অঘোরে ঘুমুচ্ছে।"

"এখন টেম্পারেচার কত?"

"একশ।"

আবার তাদের মাঝে নীরবতা নিবিড় হয়ে উঠলো। বীরেশ আর একটি সিগারেট বের করে ধরালো। পরে শায়লীর দিকে মুখ করে এক গাল ধোঁয়া ওর চোখে মুখে ছেড়ে দিলো।

"এই—যাঃ, শায়লা দাজু! তুমি ভারি ইয়ে।" শায়লী অভিমানে সরে দাঁড়ালো।

বীরেশ একটুখানি হেসে স্থির দৃষ্টিতে শায়লীর পানে তাকালো। তার মনে হতে লাগলো, শায়লী যেন সাহারার বুকে এক টুকরা ওয়েসিস্। এখানকার মৃত নেপালী সমাজের যেন শেষ প্রাণ-স্পন্দন। এই বাগানে পাঁচ বৎসরের পাহাড়ী মেয়েরা পর্যন্ত যেখানে ধূমপান করা শিখেছে এবং দস্তুরমত পিতামাতারাও উৎসাহ-ভরে এই অপকর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকে, সেখানে শায়লী শুধু ধূমপান ত্যাগই করেনি, এমন কি এর ঘ্রাণ পর্যন্ত আজ ওর কাছে অসহ্য। শায়লী ওদের সমাজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চরিত্রের মহাশ্মশানের মাঝে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন এক বিরাট প্রতিবাদ। এখানে বাঙালী বাবুদের সাথে মিশে মিশে—যেটুকু বাঁকি ছিল তা দুবছর কলকাতায় ট্রেনিঙ-এ থেকে—ও আজ মনে প্রাণে বাঙালী হয়ে উঠেছে। তাই ওর

দেহে, ওর প্রতি অঙ্গে বাঙালী মেয়ের সাবলীল মাধুরী নেমে এসেছে। শায়লী এই হাজামজা পাহাড়ী সমাজের পাঁকে পঙ্কজ, কিন্তু এর পঙ্কিলতা ওকে এতটুকু স্পর্শ করেনি।

ধীরে ধীরে বীরেশের মানসপটে ভেসে ওঠে একটি বিরাট বিপ্লবী সমাজ-সংস্থা—একটি বিশাল দেশ, যে দেশের মানুষেরা এশিয়া ও ইউরোপের এক বৃহৎ অংশ গ্রাস করে তাকে করেছে নবরূপে রূপায়িত। এই কিছুদিন পূর্বেও যাদের অনেকে বিশ্বের দরবারে ধর্মান্ধ অসভ্য যাযাবর বলে পরিচিত ছিল তারাই আজ শিক্ষার সোনার কাঠির স্পর্শে মানুষ হয়ে উঠেছে। এই কথা শুধু অলীককাহিনী নয়। এর মধ্যে মহা সত্য রয়েছে, যার চাক্ষুষ প্রমাণ তার পাশে উপবিষ্ট পাহাড়ী মেয়ে এই শায়লী। শুধু চাই সমান সুযোগ ও সমান সুবিধা, যে সুযোগ ও সুবিধা হতে আমাদের দেশের একটি বিরাট অংশ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রয়েছে। এই শায়লী সৌভাগ্যগুণে অনুপম সুযোগ পেয়েছে মানুষ হবার; তাই তার আজ পশুজীবনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু তারি সমাজের অগণিত ছেলেমেয়ে শিক্ষার অভাবে এখনো পশুর মত জীবন যাপন করছে। চা বাগানের সাহেবেরা কোন দিনই কুলীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পছন্দ করেন না। আজকাল গভর্নমেণ্টের পীড়াপীড়িতে তারা চা বাগানের দুই একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজ অনেক বাগানে লোক দেখানো গোছের হয়ে থাকে এবং শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের কাজের পরিবর্তে অধিকাংশ সময় বাগানের আফিসে কাজ করে শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। বীরেশের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ঢং করে বড় সাহেবের কুঠির ঘড়িতে একটা বাজল। শায়লী সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং ধীর পদে রোগিনীর রুমের দিকে চলে গেল।

*　　　　*　　　　*

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বীরেশ চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে ঝিমাচ্ছিল। এমন সময়ে মোটরের শব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল। সে সচকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ছোট সাহেবের গাড়ী দেখতে দেখতে হাসপাতালের গেটে এসে থামলো। বীরেশ ছুটে গিয়ে সাহেবকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

"Where is the nurse, Compounder Babu?" ছোট সাহেব বীরেশকে জিজ্ঞাসা করলো।

"She is attending upon one serious patient in the hospital, Sir." বীরেশ উত্তর দিলো।

"Call her here." ছোট সাহেব বললো।

বীরেশ ছুটে গিয়ে শায়লীকে সঙ্গে করে ছোট সাহেবের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। শায়লী সাহেবকে সেলাম করে দাঁড়ালো।

"কিয়া কর দেইছ, শায়লী ?"* সাহেব নেপালী ভাষায় বললো।

"মেরো কাম কর দেইছি।"† শায়লীও নেপালী ভাষায় জবাব দিলো।

"এতি কাম করনু, শায়লী ! বহুৎ কাম ভয়। আইলে এতা বসনু।"§ বলে সাহেব তার পাশের সিটটি দেখালো।

"ম যদি না। এতি রাত্ত, ম তেমরো সাথ কাহা যাঞ্ছু ?"** শায়লী সাহেবের মতলব বুঝতে পেরে শিউরে উঠলো।

সাহেব কাল বিলম্ব না করে টলতে টলতে গাড়ী থেকে নামলো। সে যে অত্যধিক সুরা পান করেছে তা তার প্রতি পদক্ষেপে এবং মুখের গন্ধেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল। সাহেব হঠাৎ শায়লীর গলা জড়িয়ে ধরে উন্মত্তের মত বারবার তার মুখ চুম্বন করতে করতে বললো, "Dont fear my darling."

সাহেব যে তাদের সম্মুখে এতটা ইতরামি করতে পারবে, এটা বীরেশের ধারণার অতীত ছিল। বীরেশ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শায়লী প্রাণপণে নিজেকে শয়তানটার হাত হতে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো; কিন্তু কিছুতেই সেই বজ্র-কঠিন বাহুর বন্ধন হতে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না। শায়লী সহসা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, "শায়লা দাজু, তুমি কি দেখছো হাঁ করে ? তোমার সামনেই আমাকে বদমাইসটা এমন করে অপমান করছে, আর তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছো ?"

শায়লীর কাতর তিরস্কারে বিমূঢ় বীরেশ তার লুপ্ত চেতনা ফিরে পেল। তার দেহের রক্ত মাতাল হয়ে উঠলো। কলেজী জীবনের মুগুর-ভাঁজা দেহে যেন সাবেক শক্তি ফিরে এল। বীরেশ সাহেবকে আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় সাহেবের ড্রাইভার মায়লা তাকে পিছন থেকে সজোরে এক ঘুষি মারলো।

বীরেশ কোন প্রকারে টাল সামলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং উন্মাদের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে রোগিনীর রুমে ঢুকলো। পানের শেষে তখনো দুইটি সোডার বোতল রোগিনীর শয্যার পাশের টেবিলের উপরেই ছিল। বীরেশ সেই সোডার

---

* বাংলা—কি করছো শায়লী ?

† বাংলা—আমার কাজ করছি।

§ বাংলা—এত কাম করো না, শায়লী। খুব কাজ হয়েছে। এখন এখানে এসে বস।

** বাংলা—আমি যাব না। এত রাতে তোমার সাথে কোথায় যাব ?

বোতল দুইটি দুই হাতে নিয়ে ঘর হতে ছুটে বেরুলো। এবং তার মধ্যে একটি সে যথাশক্তি ঝাঁকিয়ে নিয়ে মায়লার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো; কিন্তু মায়লা সৌভাগ্যক্রমে লাফিয়ে সরে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট সোডার বোতলটি মোটর গাড়ীর মাড্‌গার্ডে লেগে বোমার মত সশব্দে ফেটে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই ভীষণ শব্দে সাহেবের প্রেমের নেশা কিছুটা কেটে গেল। সে তখন শায়লীর গলা ছেড়ে দিয়ে তার শাড়ীর আঁচলখানি শক্ত করে ধরে একটুখানি সরে দাঁড়ালো। শায়লী ভীত কপোতীর মত যথাসাধ্য দূরে অর্ধাবৃত দেহে ওই শাড়ীর অপর প্রান্ত ধরে প্রাণপণে টানতে লাগলো। বীরেশ বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে অপর বোতলটি তেমনি ঝাঁকিয়ে নিয়ে সাহেবের শির নিশানা করে সজোরে নিক্ষেপ করলো। বোতলটি এইবার সাহেবের মাথায় লেগে সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

"My God !" বলে সাহেব ভূতলশায়ী হলো।

মাটিতে রক্তের স্রোত বইতে লাগলো।

"বাপরে বাপ্! এ কম্পাউণ্ডার বাবু ডাকু হ্যায়! ছোট সাহেব কো খুন কর্‌দিয়া।"—ভয়ে মায়লা ড্রাইভার চীৎকার করতে করতে বড় সাহেবের কুঠির দিকে ছুটে পালালো।

মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে, শায়লী এটা স্বপ্নেও ভাবেনি। সে বিমূঢ়ের মত বীরেশের মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বীরেশও হতভম্বের মত ফ্যাল ফ্যাল করে শায়লীর দিকে তাকালো। এমন সময় রোগিনীর কাতর গোঙানিতে শায়লীর চৈতন্য হলো।

কি দেখছো, শায়লা দাজু? এখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? শীগ্‌গীরি পালাও। আর এক মিনিট এখানে থাকলে ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে। শীগ্‌গীর পালাও ওই ভুটানের পাহাড়ে—পালাও বলছি।" বলতে বলতে শায়লী চেঁচিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লো।

এতক্ষণে বীরেশের হুঁশ হলো। সে ছুটে তার বাসায় গেল। সামনেই টেবিলের ওপর তার ছোট সুটকেসটি এবং টর্চটা পড়ে ছিল। তাড়াতাড়ি সেই দুইটিকে হাতে করে বের হবে, এমন সময় আলনায় দেখলো ভুটিয়া কম্বলখানি ঝুলছে। ক্ষিপ্রহস্তে কম্বলখানি কাঁধে ফেলে বীরেশ দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বড় সাহেবের কুঠি থেকে হাসপাতাল এক মাইলের কিছু বেশী হবে। এই কুঠিটি একটি পাহাড়ী টিলার উপর। বীরেশ চলে যাবার প্রায় আধঘণ্টা পরে বড় সাহেবের গাড়ী ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো। নার্সের কর্তব্যবোধে শায়লী ছোট সাহেবের রক্তাক্ত মাথাটি কোলে তুলে বসে বসে কাঁদছিল। গাড়ী হতে নেমে বড়

সাহেব ছোট সাহেবের রক্তাপ্লুত দেহের কাছে ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে শায়লীকে সান্ত্বনা দিয়ে নেপালী ভাষায় বললেন, "শায়লী! ন 'রা, ন 'রা—তেমরো সাহেব ছিটো জাতিহোউঞ্ছ।"*

ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে বাগানের ডাক্তারবাবুও এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনিও ছোট সাহেবের রক্তস্নাত দেহের দিকে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পরে ছোট সাহেবকে ধরাধরি করে হাসপাতাল ঘরে আনা হলো। শায়লীও ধীরে ধীরে ডাক্তারবাবুর পিছনে পিছনে ড্রেসিং টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। বড় সাহেব তখনি পাগলা ঘন্টি বাজাবার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুলীর দল বড় সাহেবের কুঠির সামনে এসে জমায়েত হলো। বড় সাহেব সত্যমিথ্যা অনেক কিছু মিশিয়ে কম্পাউণ্ডার বাবুকে অতি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক বলে প্রতিপন্ন করতে যেয়ে অযথা গলদঘর্ম হলেন। চিরকালের অভ্যাস বশে শ্রোতা কুলীর দল—কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে—"জি হুজুর, জি হুজুর" বলে বড় সাহেবের কথা নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিল। বক্তব্য শেষ করার পুর্বে বড় সাহেব চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"দেখো, যো আদমি কম্পাউণ্ডার বাবুকো পাকড়ানে শকে গা, উস্‌কো হাম পানশো রুপিয়া বকশিশ দেগা। উস্‌কো জিন্দা পাকড়ানে শকোগে তো বহুৎ আচ্ছা—মুর্দ্দা হনে ভি কুচ্ আফশোস নাহি।···উস্‌কো শিরকো লিয়ে পানশো রুপিয়া।"

একটি নিরীহ বাঙালী ভদ্রলোককে ধরার জন্য দলেদলে লোক গভীর রজনীতে চা-বাগানের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বীরেশ প্রথম শায়লীর কথা উপেক্ষা করে স্টেশনের পথ ধরেছিলো। কিন্তু একটু পরেই সে তার ভুল বুঝতে পারলো। হঠাৎ অদূরে সে মোটরের শব্দ শুনতে পেলো। রাস্তার মধ্য দিয়ে জল বের করে দেবার জন্য নিকটেই একটি ইট পাথরে তৈয়ারী কালভার্ট ছিল; বীরেশ দৌড়ে তার তলায় আশ্রয় নিলো। নিমেষ মধ্যে মোটরখানা তার মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল। হর্নের শব্দে বোঝা গেল ছোট সাহেবের গাড়ীটি থানার পথে ছুটে চলছে। সাথে সাথে পাগলা ঘন্টির শব্দও তার কানে গেল। আরো কানে গেল গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বড় সাহেবের চীৎকার ধ্বনি—"কম্পাউণ্ডার বাবুকো পাকড়ানে হোগা—উস্‌কো শিরকো লিয়ে পানশো রুপিয়া।"

বীরেশ সারাদেহ ভুটানী কম্বলে মুড়ে সুটকেসটিতে মাথা রেখে নির্জীবের মত সেই সাঁকোটির তলায় পড়ে রইলো। মাঝে মাঝে কুলীদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদধ্বনি বীরেশের কানে আসতে লাগলো। একদল সাঁওতাল কুলী হুল্লোড় করে তার মাথার

* বাংলা—শায়লী! কেঁদো না, কেঁদো না—তোমার সাহেব শীগ্‌গীর ভাল হয়ে যাবেন।

উপর দিয়ে চলে গেল—পানশো রুপয়া, আউর পিনেকো বহুৎ দারুভি মিল জায়েগা—পাঝেড়, পাঝেড়—পা-ঝে-ড়।"

প্রায় সারারাত ধরে চললো কুলীদের দৌড়াদৌড়ি আর মোটরের ছুটাছুটি। নিশির শেষে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা তরল অন্ধকারে নিবিড় হয়ে উঠলো। ক্লান্ত কুলীর দল যে যার ঘরে ফিরে গেল। বীরেশ আস্তে আস্তে উঠে আপাদমস্তক ভুটিয়া কম্বলে জড়ালো। তারপর দ্রুতপদে অদূরে ভুটান-সীমান্তের দিকে চললো।

চার

সেই রাত্রিতেই স্থানীয় থানার দারোগা এসে বড় সাহেব, মায়লা ড্রাইভার, শায়লী ও ডাক্তারবাবুর বিবৃতি লিখে নিলো। রাত্রিতেই প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ করে ডাক্তারবাবু ছোটসাহেবকে নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে চলে গেলেন। পরদিন সকাল বেলায় সাহেব একবার জ্ঞান হয়ে কিছুক্ষণ ছিল। সেই সময় সাহেবের মৃত্যুকালীন বিবৃতি নেওয়া হয়। তাতে বীরেশকেই একমাত্র অপরাধী বলে ছোট সাহেব বর্ণনা করেন। ডাক্তারদের শতচেষ্টা সত্ত্বেও রক্তপাত একেবারে বন্ধ হলো না। সন্ধ্যার সময় ছোট সাহেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বীরেশকে ধরবার জন্য সেইদিনই গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা বের হলো।

* * * *

ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়াগুলির এ-পাশে ও-পাশে বিচ্ছুরিত আলোর রশ্মিগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করে করে নিভে গেল। আবার উঠলো চাঁদ—শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ তৃতীয় দিনের ওই সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করে, আর শায়লীর হৃদয়াকাশে নামলো অমানিশার গাঢ়তমা তমিস্রা, যে তিমিরে পথিক হয় দিশেহারা।

শায়লী উদাস নয়নে ওই গিরি-শিখরগুলির দিকে চেয়ে আছে। আস্তে আস্তে একটা অবসাদের আবেশ চারিদিক থেকে শায়লীকে যেন ছেয়ে ধরলো। শায়লীর মা এক কাপ চা এনে শায়লীর সম্মুখে রাখলো। কিন্তু ও সেদিকে ফিরেও একবার তাকলো না। শায়লী ভাবতে লাগলো—শায়লা দাজু কোথায় গেল? সে তো সাধারণত তার উপদেশ অবহেলা করে না। যদি সে পাহাড়ে না যেয়ে থাকে, তবে কোথায় যাবে? কলকাতা? কিন্তু কি করে তা সম্ভব? সেদিন যে রাস্তায় মোটরগাড়িগুলো এবং বাগানের চারিদিকে কুলীর দল জোনাকির মত বীরেশকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সাহেব খুন। নিরীহ বাঙালীর এত বড় দুঃসাহস। স্থানীয় রেলস্টেশন হতে নিকটবর্তী জংশন পর্যন্ত টেলিগ্রাম টেলিফোনে স্টেশনগুলি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পাশের বাগানের সাহেব ম্যানেজারদের মোটর নিয়ে ছুটাছুটি, পুলিসবাহিনীর দৌড়াদৌড়ি—এর মধ্যে কি করে সম্ভব? হঠাৎ কার শীতল করস্পর্শে শায়লী ফিরে তাকালো; দেখলো তারি স্নেহপ্রবণ পিতা, রামচন্দ্র।

শায়লী হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো, "বাবুজী !"

"বেটী, কিন রুন্ দেইছ ? শায়লা বাবু আউঞ্ছ, আউঞ্ছ—।"* রামচন্দ্র নেপালী ভাষায় মেয়েকে প্রবোধ দিয়ে বললো।

"না আওন্দেই না—কাহা গয়ো কাহা গয়ো।"+ শায়লী কাঁদতে কাঁদতে নেপালী ভাষায় উত্তর দিলো।

রামচন্দ্র এর কোন সদুত্তর দিতে পারলো না। শুধু মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে—"আউঞ্ছ, আউঞ্ছ" ± বলে নীরব হলো।

হঠাৎ রামচন্দ্রের দৃষ্টি মেয়ের পাশের টেবিলের উপর পড়লো। শায়লীর চা যেমন তার মা টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি পড়ে রয়েছে। শায়লী চায়ের কাপটি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

"চিয়া কিন খায়োনা, বেটী ?"§ রামচন্দ্র চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দেখলো চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সে তখন শায়লীর মাকে ডেকে আবার চা দিতে বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ; কারণ কন্যার কাতরতা পিতাকেও ব্যাকুল করে তুলছিল।

রামচন্দ্র শুধু এই বাগানের কুলীদের মুন্সীই নয় ; সে কুলীদের সর্দারও বটে। তাই অন্যান্য নেপালী অধিবাসীদের চেয়ে এ বাগানে রামচন্দ্রের পদমর্যাদা অনেক বেশী, অর্থাৎ রামচন্দ্রের স্থান বাগানের বাঙালী বাবুদের নীচেই। রামচন্দ্র নিজের অনুগত কুলীদের দিয়ে গোপনে বীরেশের খোঁজ করছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সন্ধান পায়নি।

ছোট সাহেবের খুনের ঘটনা রামচন্দ্র সবই তার কন্যার কাছে শুনেছিলো। ছোট সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও রামচন্দ্রের ছিল। কন্যার যে বীরেশের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে তা রামচন্দ্র কিছু কিছু টের পেয়েছিলো। কিন্তু তার যে এত দ্রুত এই পরিণতি হবে, রামচন্দ্র পূর্বে তা চিন্তা করতে পারেনি। এখন তার কি করার আছে ? মেয়ে বড় হয়েছে—মেয়ে শিক্ষিত। মনে প্রাণে ও দেহের পারিপাট্যে সে পূর্ণ বাঙালী হয়ে উঠেছে। সে কথা আজ জানতে পেরে রামচন্দ্র অতি দুঃখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। বীরেশ চলে গেছে। সে আর ফিরবে না। যদি সে কোনদিন ফিরেও আসে, তবু তাকে এই রাজ্যের আইন বাঁচতে দেবে না।

---

* বাংলা—মা, কেন কাঁদছো ? শায়লাবাবু আসবেন, আসবেন – ।

+ বাংলা—না, আসবেন না—কোথায় না কোথায় গেছেন।

‡ বাংলা—আসবেন, আসবেন।

§ বাংলা—চা কেন খাওনি, মা ?

এটা রামচন্দ্র বেশ জানে তার কন্যা যতই শিক্ষিত হোক না কেন, কোন ভদ্র বাঙালী ঘরের ছেলে শায়লীকে কোনদিনও বিয়ে করবে না। শায়লীও ওর এই বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচি নিয়ে কোন নেপালী যুবককে বিয়ে করতে পারবে না। শায়লী বাংলা কেতাব পড়তে পারে, সাহেবদের সাথে ইংরেজীতে কথা বলে; বাবুয়ানীদের (বাঙালী বাবুদের স্ত্রীদের) সঙ্গে বেশভূষায় সমান তালে চলে। এসব দেখে রামচন্দ্রের বুকখানা গর্বে ফুলে উঠতো; কিন্তু আজ তা-ই যে ওর কাল হয়ে দাঁড়ালো। রামচন্দ্র তার ঘরের বারান্দায় বসে বসে এই কথাই ভাবছিল। দুঃখে তার চোখের কোণ থেকে দুই ফোটা জল ঝরে পড়লো।

রামচন্দ্র বের হয়ে গেলে শায়লী আবার চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। ও আবার ভাবতে লাগলো—শায়লা দাজু যদি পাহাড়ে যেয়ে থাকে, তবে? ভুটানের পথে সে বেশীদূর যেতে পারবে না। তাছাড়া ভুটানী পথঘাট ভীষণ কদর্য ও বিঘ্নসঙ্কুল। সেখানে একজন বাঙালীর পক্ষে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া শুধু দুঃসাহসই নয়, বরং একাজ দুর্বুদ্ধিরই কিছুটা পরিচায়ক। অতি তুচ্ছ কারণে সেখানে মানুষের জীবননাশ ঘটা বিচিত্র নয়। হিংস্র জানোয়ার, চোর, ডাকাত তো আছেই, তার উপর আছে সে দেশের নৃশংস অধিবাসী, যারা অতি সামান্য কারণে সন্দেহভাজন বিদেশীকে হত্যা করে থাকে। শৈশবে শায়লী যখন একবার তার মামা বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন সে দেখেছিল, ভুটানীরা সন্দেহক্রমে একজন মারোয়াড়ীকে কিরূপ হিংস্র পশুর মত হত্যা করেছিল। সেই দৃশ্য আজ শায়লীর মানসপটে ফুটে উঠলো। ঘটনার দিন উত্তেজনার মুহূর্তে শায়লী কেবলমাত্র ভুটানী পাহাড়ের নাম উচ্চারণ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বলতে পারেনি। আজ সে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে চোখ বুজলো। দু গাল বেয়ে তার অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে শায়লীর মা আবার এক কাপ চা হাতে করে ঘরে ঢুকলো। কন্যার এই অবস্থা দেখে ক্ষণকাল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে চায়ের কাপটি শায়লীর সম্মুখে টেবিলের উপর রেখে ধীরে ধীরে নিজের পরিহিত বস্ত্রের প্রান্ত দিয়ে শায়লীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি মুছে দিলো।

"এতি ন রো, শায়লী! চিয়া খানু মেরো নানী।"* বলতে বলতে শায়লীর মা শায়লীর পিঠে মৃদুভাবে হাত বুলাতে লাগলো।

শায়লী বেদনা-করুণ নয়নে তার মার দিকে তাকালো, পরে চায়ের কাপটি টেবিলের উপরিস্থ বুদ্ধ মূর্তিটির সামনে রেখে বিড় বিড় করে যেন কি বলতে লাগলো। শেষে এক নিঃশ্বাসে পান শেষ করে শূন্য চায়ের কাপটি মার হাতে দিলো।

* বাংলা—এত কেঁদো না, শায়লী।—চা খাও আমার বেটী!

সাহেবদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবার উপক্রম। খোদ পুলিস সাহেব এসে এই বাগানে দুইদিন কাটিয়ে গেছেন। দুইদিন আড়াই দিন হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার; বাগানের কাজ একরূপ বন্ধ হবার মত হয়েছিল। তৃতীয় দিনের বিকাল হতে আবার বাগানের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আসামীকে খুঁজে বের করবার আশা সকলেই প্রায় একরূপ ত্যাগ করেছে। বাগান ছেড়ে যাবার পূর্বে পুলিস সাহেব অভিমত প্রকাশ করেছেন—আসামীকে আর পাওয়া যাবে না। সে ভুটান রাজ্যে পালিয়েছে।

বড় সাহেবও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শায়লীকে সাত দিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে। বড় সাহেব ভেবেছেন, শায়লী ছোট সাহেবের শোকে মুহ্যমান। কারণ ছোট সাহেবের নজর যে শায়লীর উপর ছিল, তা বড় সাহেব জানতেন। এবং ছোট সাহেবের চেষ্টায়ই শায়লীর বেতনের একটা স্পেশাল গ্রেড হয়েছিল। নেপালী মেয়েদের সাহেব-প্রীতির খ্যাতি এ অঞ্চলে যথেষ্ট রয়েছে। সাহেবদের নেকনজরে পড়া নেপালী মেয়েদের সৌভাগ্যের বিষয়। তাই ভাগ্য বিপর্যয়ে শায়লী একটু কাতর হয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য কি? শতকরা নিরানব্বইটি নেপালী মেয়ের চরিত্র দিয়ে বড় সাহেব শায়লীকে বিচার করেছেন। শায়লীই যে এই হত্যার মূল—এটা বড় সাহেবের ধারণার অতীত। তাই বীরেশের ঘর তালা বন্ধ করে বড় সাহেব রামচন্দ্রকেই সেই ঘর-পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন, এবং ঘরের চাবি রামচন্দ্রকেই দেওয়া হয়েছে।

শায়লী বড় সাহেবের এই বোকামিতে যে সুযোগ পেল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করছে। এই সুবর্ণ সুযোগে হয় সে বীরেশকে রক্ষা করবে—নয় মরবে। তাই সে প্রতিদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে—হে ঈশ্বর, শায়লা দাজুকে কলকাতায় নিয়ে যেও না। বীরেশ যদি একবার কলকাতায় পৌছতে পারে, তবে সেই জন-সমুদ্রে সে যে কোথায় হারিয়ে যাবে, তার হদিস কোন দিন আর পাওয়া যাবে না। পাহাড়ে গেলে, পাহাড়ী মেয়ে সে, খুঁজতে খুঁজতে একদিন হয়তো তাকে পাবে।

সারারাত্রিতে শায়লীর একটুও ঘুম হয় না। বৃক্ষের প্রতি মর্মরে, বাতাসের প্রতি নিস্বনে ওর মনে হয়—ওই বুঝি শায়লা দাজু আসে···ওই বুঝি ওকে ফিসফিস করে ডাকে। রাত্রিতে ভুল করে কতবার যে শায়লী দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকে বীরেশের জন্য, তার ঠিক নেই। কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নৈশ নিস্বনে মিশে যায়। ওর বুকের মধ্যে হুহু করে ওঠে, চোখ ভরে ওঠে জলে। দুয়ার কোন প্রকারে বন্ধ করে ও বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদে আর কাঁদে, যতক্ষণ না ওর বুকের বেদনা চোখের জলে ধুয়ে কিছুটা হালকা হয়।

প্রতিদিনই শায়লী ভাবে, আজ শায়লা দাজুকে খুঁজতে ও যাবে ভুটান সীমান্তে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হয়, ও বাড়ী ছেড়ে গেলে যদি শায়লা দাজু ইতিমধ্যে এসে ওকে না দেখে ফিরে যায়। এই আশায় শায়লী ঘর ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে থাকে না। ও ঠিক করেছে, ছুটির সাতদিন শেষ হয়ে গেলে চাকরী ছেড়ে ও মামাবাড়ী ভুটানে চলে যাবে এবং সেখানে থেকে ও বীরেশের অনুসন্ধান করবে।

শায়লীর কেন যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বীরেশ নিশ্চয়ই আবার ওর কাছে ফিরে আসবে এবং অতি শীগ্‌গীরই আসবে। তাই শায়লী তার বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে বীরেশের ঘরে ঢুকে তার প্রিয় ও মূল্যবান জিনিসগুলি একটি একটি করে থুক্কেতে* সাজিয়ে নিজের ঘরে এনে রেখেছে। নিকটবর্তী পোস্টাফিস হতে ও ওর বাবাকে দিয়ে ওর সঞ্চিত পাঁচ শো টাকা তুলে এনেছে। আজ সারা দিনভর শায়লী ওর প্রিয় ও আবশ্যকীয় জিনিসগুলি তেমনি আর একটি থুক্কেতে সাজিয়ে রেখেছে। রামচন্দ্র তার মেয়ের পাগলামি লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তাকে বাধা দিতে সাহস হয়নি। এবং ডাক্তারবাবুও শায়লীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে রামচন্দ্রকে নিষেধ করেছেন। বীরেশ আর আসবে না—এই কথা শায়লীকে বলা চলবে না। কারণ তাতে ও পাগল হয়ে যেতে পারে। রামচন্দ্র ডাক্তারবাবুর এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। শায়লীর যে বীরেশের প্রতি একটা মমত্ব-বোধ আছে তার খবর ডাক্তারবাবুও কিছু রাখতেন। তিনি একে সহকর্মীর আন্তরিকতা বলেই ভেবে-ছিলেন। উপরন্তু ডাক্তারবাবু বীরেশ ও শায়লীকে নিজের ছেলেমেয়ের মত স্নেহ করতেন। এই স্নেহ-প্রবণতাই বোধহয় তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হ্রাস করেছিলো। কবে একবিন্দু জলকণা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাষাণের বুক বেয়ে নেমে এসেছিলো, তাই যে একদিন পাষাণের বুক ভেঙে কূল ভাসিয়ে চলে যাবে—এরকমভাবে চিন্তা করার অবকাশ স্নেহান্ধ পিতা রামচন্দ্র কিংবা স্নেহপ্রবণ ডাক্তারবাবু কেউই এতদিন পাননি। ডাক্তারবাবু ও রামচন্দ্র ছাড়া এ বাগানের আর বিশেষ কেউ এই ব্যাপার টের পায়নি। এবং তারা উভয়েই এই দুইটি তরুণ ও তরুণীকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত চা বাগানের ম্যানেজারের কাছে তাঁরা নিতান্তই স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় নগণ্য, এবং তাঁরাও নিজেদের এ ব্যাপারে বড়ই অসহায় মনে করছেন।

এদিকে সমস্ত বাগান ভরে ঢি ঢি পড়ে গেছে যে, শায়লী ছোট সাহেবের শোকে

* থুক্কে—বাঁশ বা বেত দ্বারা বুনানো টুকরি বিশেষ।

পাগল হতে বসেছে। বড় সাহেব বড় বাবু মারফত এই খবর পেয়ে শায়লীর প্রতি দিন দিন খুব সদয় হয়ে উঠছেন।

আজ দুইদিন হলো যখনই শায়লীর প্রাণ বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ও তখনি সেই বুদ্ধ মূর্তিটির নিকট বসে চোখ বুজে বেদনার্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজতে চেষ্টা করে। এক বৎসর পূর্বে শায়লী যখন একটি ভিক্ষুক বৌদ্ধ লামার নিকট হতে দশ টাকা প্রণামী ও কিছু চা ভেট দিয়ে এই ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তিটি কিনেছিল তখন তাদের পাড়ার সকলেই বলেছিল—চতুর লামা শায়লীকে ঠকিয়েছে।

বীরেশ কৌতুকভরে বলেছিল, "শায়লী, স্ত্রীলোক যত বিদুষী ও যত বুদ্ধিমতীই হোক্, তাকে পুরুষের বুদ্ধির কাছে পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।"

এর উত্তরে শায়লী বলেছিল, "বেশ মশায়, বেশ। আমরা আপনার মত বুদ্ধির জাহাজ হতে চাইনে।"

শায়লী আজ সেই দশ টাকার বুদ্ধ মূর্তির কাছে আত্মার অমূল্য সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে। কে যেন অন্তর্লোক হতে ওকে বলে দিচ্ছে—ভুটান দেশের গভীর অরণ্যে কেউ যদি বীরেশকে রক্ষা করে, তবে সে এই ধ্যানী বুদ্ধ। বীরেশকে শায়লীর কাছে যদি কেউ এনে দেয়, তবে সে এই ধ্যানী বুদ্ধই এনে দেবে। যদি কোন দিন বীরেশ ও শায়লীর ভুটানের ওই গভীর অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রা শুরু হয়, তবে সেদিনও একমাত্র সাথী হবে এই ধ্যানী বুদ্ধ। শায়লী ভুটান-দেশীয় কারুকার্যখচিত কাঠের কেসটিতে-ভরা তথাগত ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটিকে বুকে করেই রাত্রিতে নিদ্রা যায় এবং ভোরে ঘুম হতে উঠে মূর্তিটিকে প্রণাম করে টেবিলের উপর রেখে দেয়। শায়লী ওর নির্জন কক্ষে স্নেহময় পিতা এবং এই বুদ্ধ মূর্তিটি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আজকাল বড় একটা কথা বলে না।

পাঁচ

শীতের স্তব্ধ রাত্রি। রজনী সুগভীর না হলেও ইতিমধ্যেই মৃত্যুশীতল নিঝুমতা হিমালয়ের পা ছোঁয়া এই চা বাগানটিকে ছেয়ে ফেলেছে। ঠক্ ঠক্ ঠক্—সহসা শায়লীর তন্দ্রা টুটে গেল। বুদ্ধমূর্তিটিকে শয্যার পাশে রেখে শায়লী এক লাফে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর বুক দুর দুর করে কাঁপতে লাগলো, সর্বাঙ্গ হয়ে উঠলো স্বেদসিক্ত। আজকাল শায়লী শ্রবণশক্তির উপর যেন বিশ্বাস হারাতে বসেছে। কারণ এরকম ভুল ওর এই কয়েক দিনে অনেক বার হয়ে গেছে। শায়লী সংশয়াকুল চিত্তে ভাবতে লাগলো, সে স্বপ্ন দেখেনি তো! এমন সময় আবার—ঠক্ ঠক্ ঠক্! থর থর করে কাঁপতে লাগল শায়লীর দেহ। রুদ্ধ আবেগে ও দরজায় কান পাতলো। কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে ওকে ডাকছে, "শায়লী, আমি—আমি। শীগ্‌গীর দরজা খোল, কেউ দেখে ফেলবে।"

এবার আর শায়লীর বুঝতে বাকী রইল না। শায়লী কম্পিত হস্তে দরজা খুলে আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিলো। বীরেশ ঘরে ঢুকে তার গায়ের ভুটিয়া কম্বলটি মেজের উপর ফেলে দিয়ে হাতের সুটকেসটি টেবিলের উপর রাখলো। শায়লী শত চেষ্টাতেও রুদ্ধ কান্নার আবেগ রোধ করতে পারলো না। বীরেশকে জড়িয়ে ধরে সে তার বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে, "শায়লা দাজু, এই কালামুখীর জন্য তোমার কপালে এত দুঃখও ছিল! আমায় তোমার দুঃখের সাথী করে নিয়ে চল, দাজু!" বীরেশ নীরবে দাঁড়িয়ে শায়লীর মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

ঢং ঢং করে বড় সাহেবের কুঠিতে এগারটার ঘণ্টা বাজলো। শায়লী সন্ত্রস্তভাবে বীরেশের বাহুপাশ হতে নিজেকে মুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বীরেশ টলতে টলতে তার অনাহার-ক্লিষ্ট দেহখানি শায়লীর বিছানায় এলিয়ে দিলো।

"আর পারিনে, শায়লী! আজ তিনদিন শুধু ঝরনার জল আর জংলী ফল খেয়ে কাটিয়েছি। খিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছে। রাত্রি ভোর হলে আমি বড় সাহেবের কাছে ধরা দেব, ঠিক করেছি।" অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বীরেশ বললো।

"না কিছুতেই না। শায়লী গ্রীবা বাঁকিয়ে প্রতিবাদ করলো। তারপর এক গ্লাস জল ও একখানা আসন পেতে দিয়ে সে বীরেশকে বসতে ইঙ্গিত করলো।

বীরেশ মাতালের মত সেই আসনে গিয়ে বসলে শায়লী তার রাত্রির অভুক্ত আহার্যের থালাখানি বীরেশের সামনে এনে দিলো। বিনা বাক্য ব্যয়ে বীরেশ গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আহার শেষ করে অবশেষে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বীরেশ প্রশান্ত নয়নে শায়লীর দিকে তাকালো।

"কি দেখছো?" শায়লী মৃদু হেসে বললো।

"তুমি কি জানতে পেরেছিলে, আমি আজ আসবো?" বীরেশ শুধালো।

"নিশ্চয়ই, আমাকে যে ঠাকুর আগেই খবর দিয়েছিলেন। তাইতো আমি একেবারে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি।" মৃদু হেসে শায়লী শয্যার পার্শ্বস্থিত ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তিটিকে দেখালো।

"বটে, এত ভক্তি।" বীরেশ ঈষৎ হেসে বললো।

"তবে কি সবাই তোমার মত ভক্তিহীন ভ্যাগাবণ্ড হবে নাকি?" স্মিত মুখে উত্তর দিয়ে শায়লী চা করার জন্য স্টোভ জ্বালাতে আরম্ভ করলো। বীরেশ মুখ ধুয়ে নির্জীবের মত আবার শায়লীর বিছানায় শুয়ে পড়লো। একটা অবসাদের আবেশে বীরেশের সারা দেহ আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসতে লাগলো।

এমন সময় আঙিনায় শায়লীর পিতার পদধ্বনি শোনা গেল। রামচন্দ্র ডাকলো—"শায়লী, এগারটা বাজ গয়। এতি রাতমে কিয়া কর দেইছ, বেটী!"*

"চিয়া বানাওঙ্গু, বাবুজী!—এতা আওনুহস্, বাবুজী।+" শায়লী উঠে দরজা ঈষৎ খুলে দিলো।

রামচন্দ্র ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে বললো—"শায়লা বাবু!"

শয্যা ছেড়ে নত মস্তকে রামচন্দ্রের নিকটে এসে বীরেশ চাপা গলায় বললো, "হাঁ, মুনশী!"

"তুমি যে একদিন আসবে, তা আমি আগেই জানতাম। আমি শায়লীকেও তা অনেকবার বলেছি, কিন্তু ও আমার কথা বিশ্বাস করতো না। বোকা মেয়ে খাওয়া-দাওয়া ঘুম সব কিছু ছেড়ে ঘরে বসে শুধু দিনরাত কাঁদতো।" রামচন্দ্র স্পষ্ট বাংলায় কথাগুলো বললো।

বাগানের বাঙালী বাবুদের সাথে মিশে এবং ডাক্তারবাবু, বীরেশ ও শায়লীর সাথে বাংলা বলে রামচন্দ্র মোটামুটি ভাল বাংলা শিখেছে। বীরেশকে দেখলেই রামচন্দ্রের বাংলা বলার কেমন যেন একটা রোখ চাপে। বীরেশের নেপালী ভাষায়

---

* বাংলা—শায়লী, এগারটা বেজে গেছে। এত রাতে কি করছো, বেটী।

+ বাংলা—চা বানাবো, বাবুজী। এখানে আসুন, বাবুজী।

অসাধারণ বাক্‌পটুতা দেখে বৃদ্ধ নেপালীর মনে বোধহয় একটা প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগে। এ যেন বীরেশের নেপালীর জবাবে রামচন্দ্রের বাংলায় উত্তর।

"ইস্ আমার ভারি দায় পড়েছিল কাঁদবার।" সলজ্জ নয়নে ও স্মিত মুখে শায়লী পিতার প্রতিবাদ করলো।

"আর পারছিনে। তিন দিন অবিরাম পাহাড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে অনাহারে ঘুরে ঘুরে আজ দুনিয়া আমার কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বড় সাহেবের কাছে ধরা দিতে এসেছি, মুনশী।" বীরেশ ক্ষীণ কণ্ঠে বললো।

"তা হয় না। তুমি বুঝতে পারছ না, শায়লা বাবু—বড় সাহেবের কাছে ধরা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের হাতে মাথাটা ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া। আমি থাকতে তোমাকে এ কাজ কিছুতেই করতে দেব না।" বলতে বলতে পাহাড়ী রামচন্দ্রের মুখখানা বুঝি পাহাড়ের মত কঠিন হয়ে উঠলো।

"তবে আমায় এখন কি করতে বল, মুনশী?" বীরেশ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসে থেকে বললো।

তোমার কি-করা না-করা—সবই শায়লী ঠিক করে রেখেছে, শায়লা বাবু!" বলে হাসিমুখে বৃদ্ধ রামচন্দ্র ঘরের কোণে সুসজ্জিত দুইটি থুঞ্চে আঙুল দিয়ে বীরেশকে দেখিয়ে দিলো।

বীরেশ সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো, ইতিমধ্যে তার ভুটানী কম্বলখানা এবং স্যুটকেশটি অবধি ওই থুঞ্চে দুইটির একটিতে সযত্নে সাজানো হয়েছে। শায়লীর মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ রামচন্দ্র ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, "আমি জলপাইগুড়িতে উকিলবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে তোমাকে অন্ততঃ বার বৎসর আত্মগোপন করে থাকতে হবে। শায়লী যখন তোমার সাথে থাকবে, তখন তোমার পক্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের বাইরে ভুটানে থাকাই ভাল। শায়লীর মামাবাড়ী ভুটানে। দক্ষিণ ভুটানের ভাষা, আচার, ব্যবহার—সব কিছুর সঙ্গে শায়লী পরিচিত। তুমি নেপালী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পার। তাছাড়া, গায়ের রং আর স্বাস্থ্যও তোমার সুন্দর। তোমাকে নেপালী বা ভুটানী বলে চালানো শায়লীর পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রামচন্দ্র থামলো।

পিতার যে নেশা করার অভ্যাস আছে শায়লী তা জানে, এবং বীরেশেরও শ্রম-কাতর ও অনাহার ক্লিষ্ট দেহ। অধিকন্তু তাকে এখনি দীর্ঘ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে ব্রিটিশ সীমান্ত পার হতে হবে। তাই শায়লী বীরেশ ও তার পিতার চায়ের সঙ্গে

কিঞ্চিৎ 'ভাইনামগেলেসিয়া' মিশিয়ে দু কাপ চা প্রস্তুত করে তাঁদের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখলো। এবং নিজের জন্যও সেই সঙ্গে এক কাপ তৈরী করে নিলো।

রামচন্দ্র ও বীরেশ মুখোমুখি বসে চা পান করতে লাগলো। শীতের নিঝুম রাত্রি। শায়লী তার চা পান শেষ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দু-একটি জিনিস যা তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল, সেগুলি থুঙ্কেতে ভরছিল। রামচন্দ্র ও বীরেশ নীরব, উভয়ের মুখ বেদনা-মলিন। কতক্ষণ যে তাদের এভাবে কেটে গেল, তা কারো খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বড় কুঠিতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। রামচন্দ্র শঙ্কিতভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে শায়লী ডাকলো, "বাবুজী"!

"হাঁ বেটী"!—রামচন্দ্র দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। শয্যায় শায়লীর মা ও ছেলেমেয়েরা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। রামচন্দ্র তাদের কাউকে না ডেকে বাক্স খুলে ভুটানী গরম কাপড়ের একটি ভুটিয়া সুড়ল* ও একটি ভুটিয়া জামা বের করলো। সুড়ল ও জামাটি নিয়ে রামচন্দ্র আবার দ্রুত শায়লীর ঘরে প্রবেশ করলো। জামা ও সুড়লটি বীরেশের হাতে দিয়ে রামচন্দ্র বললো, "শীগ্‌গীর পরে নাও। আর এক মিনিটও দেরী করে না। রাত্রি থাকতে থাকতে তোমাদের সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে। অন্ততঃ সীমান্তের কাছাকাছি যেতে হবেই।"

বীরেশ পশ্চাতে চেয়ে দেখলো, শায়লী নিখুঁত পাহাড়ী সাজে সেজে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। বীরেশ আর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করলো। রামচন্দ্র তার মাথার টুপিটি বীরেশের মাথায় পরিয়ে দিলো। সহসা বীরেশ টেবিলের উপর আয়নায় প্রতিফলিত তার প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠলো—একি সেই বীরেশ! নিজেকে সে নিজেই যেন চিনতে পারছে না। তাহলে সত্যই কি আজ বাঙালী বীরেশের মৃত্যু ঘটলো? একটা দীর্ঘশ্বাস বীরেশের অন্তস্তল হতে বেরিয়ে এলো।

এমন সময় রামচন্দ্র ডাকলো, "শায়লা বাবু!"

"এই যে আমি প্রস্তুত মুন্‌শী।" বীরেশ ত্রস্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালো।

"শায়লা বাবু, তুমি থুঙ্কে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে না। তাই আমি তোমাদের বাগানের সীমানা পার করে 'ফরেস্ট' অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবো।" বলতে বলতে রামচন্দ্র থুঙ্কেটি পিঠে করে উঠানে নামলো। শায়লী তার আগেই থুঙ্কে পিঠে তুলে, কটিদেশে ভুজালী বেঁধে আঙিনায় অপেক্ষা করছিলো। ওর ডান হাতে ঝক্ ঝক্ করছিলো একটি শানিত বৃহদাকার বর্শা।

*সুড়ল—পাজামা।

প্রায় আধঘণ্টা আঁকা বাঁকা পার্বত্য পথ হেঁটে তারা 'গভর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্টে'র সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। এই অরণ্য জলপাইগুড়ি জেলা হতে শুরু করে দার্জিলিং জেলার সীমান্ত ঘেঁষে ভুটানের গভীর অরণ্যানীর সঙ্গে মিশে গেছে। রামচন্দ্র এখানে এসে থামলো। আস্তে আস্তে থুঞ্চেটি ভূমিতে নামিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে দাঁড়ালো। শায়লী তার থুঞ্চেটি মাটিতে রেখে পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর বীরেশ বিষণ্ণ নয়নে চেয়ে রইল শুধু অরণ্যের দিকে; তখন আকাশ হতে অঝোরে ঝরছিল ভেজা চাঁদের আলো নিঝুম নিথর রাতের নিস্তব্ধ বনানীতে।

"ছিঃ বেটী, অমন করে কাঁদে না। তোমার সাথে তোমার শায়লা দাজু রইল, সে-ই তোমাকে রক্ষা করবে। তুমিও তোমার বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে শায়লা দাজুকে রক্ষা করো, বেটী। আর তোমরা ভগবান বুদ্ধের দেশে যাচ্ছ, তিনিই তোমাদের সর্বদা রক্ষা করবেন—ভয় কি বেটী? আমি আশীর্বাদ করছি, তোমাদের পথ বিপদ-মুক্ত হবে।" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রামচন্দ্র কন্যার মাথায় মৃদু হস্তসঞ্চালন করতে করতে বললো। অদূরে বনের মধ্যে একটি হরিণী ডাকতে লাগলো বার বার।

"আর দেরী করো না, বেটী। বলা যায় না, এখানে বেশী দেরী করলে হয়তো প্রহরীরা কেউ দেখে ফেলতে পারে।" রামচন্দ্র ধরা গলায় বললো।

শায়লী আর কালবিলম্ব না করে পিতাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। রামচন্দ্র বাষ্পজড়িত কণ্ঠে ডাকলো, "শায়লা বাবু!"

বীরেশ যন্ত্রচালিতের মত ফিরে দাঁড়ালো। রামচন্দ্র কম্পিত হস্তে বীরেশের একখানি হাত নিয়ে শায়লীর হাতের উপর রাখলো। তারপর সে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো—"শায়লা বাবু, আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় যে, আজু তাকেই তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি ওকে গ্রহণ করো।"

রামচন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলতে পারলো না; কান্নার রুদ্ধ আবেগে বৃদ্ধ নেপালীর কথা বন্ধ হয়ে আসছিলো। শুধু এক ফোটা তপ্ত অশ্রু তার চোখ থেকে বীরেশের হাতের উপর গড়িয়ে পড়লো। বীরেশ শিউরে উঠলো। সহসা রামচন্দ্রের মাঝে বীরেশ যেন আজ তার স্বর্গত পিতাকে দেখতে পেলো। কিন্তু বহুদিনের অন্ধ সংস্কার তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। সে কিছুতেই বিদায়বেলায় বৃদ্ধ নেপালীর পায়ে মস্তক অবনত করতে পারলো না, যদিও অন্তর তার রামচন্দ্রের পায়ে লুটিয়ে পড়বার জন্য আকুলি বিকুলি করছিলো। বীরেশ একটি শব্দও করতে পারলো না। কেবল নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মত মস্তক অবনত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্ষণকাল নীরব থেকে বৃদ্ধ রামচন্দ্র বললো, "আর তোমরা দেরী করো না,

শায়লা বাবু! এই পথ তোমাদের ভুটানের অন্তস্তলে পৌছে দেবে। এ পথের সঙ্গে শায়লীও পরিচিত। এ রাস্তা সোজা কিন্তু গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে এবং কিছু দুর্গমও বটে একমাত্র এই পথে গেলেই তোমরা মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ চলতে পারবে। তাই তোমাদের এই পথে এনেছি।"

রামচন্দ্র ত'র কটিবন্ধ হতে শানিত বড় খুক্‌রীখানি খাপসমেত খুলে বীরেশের কোমরে বেঁধে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে ভূমি হতে বীরেশের পিঠে থুঞ্চেটি তুলে দিলো। শায়লী তার থুঞ্চেটি পিঠে করে চোখ মুছতে মুছতে বনের পথে অগ্রসর হলো। বীরেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত শায়লীর অনুগমন করলো কিছুদূর গিয়ে শায়লী ও বীরেশ পিছন ফিরে দেখলো—বৃদ্ধ রামচন্দ্র তেমনি তাদের দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। শায়লী ফিরে চাইতেই রামচন্দ্র ঈষৎ হস্ত আন্দোলিত করে বিদায় জানালো এবং ইঙ্গিতে পথ চলতে বললো। শায়লীও হাত নেড়ে পিতার প্রত্যুত্তর দিলো। যতক্ষণ পর্যন্ত বীরেশ ও শায়লী অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে না গেলো, ততক্ষণ রামচন্দ্র তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে নিস্পন্দভাবে।

ছয়

বিসর্পিল রেখায় পাহাড়ী পথ কখনো গিরি-গাত্র বেয়ে, কখনো গিরি-গুহার ভিতর দিয়ে চলেছে। দীর্ঘ দুর্গম পথ। শায়লী বনহরিণীর মত সেই পথ বেয়ে চলতে লাগলো, এবং মাঝে মাঝে থেমে বক্ষে দোদুল্যমান টর্চ দিয়ে শীর্ণ বনপথের নিশানা বের করতে লাগলো। বীরেশ যন্ত্রের মত শায়লীকে অনুগমন করে চললো। কিন্তু সে শায়লীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে পারছিলো না। শায়লী নীরবে পথ চলছিলো। ওর যেন পশ্চাতে ফিরে চাইবার সময় নেই। যেমন করে হোক তাকে আজ বৃটিশ সীমান্ত অতিক্রম করে যেতে হবেই হবে। বীরেশ প্রাণপণে শায়লীকে অনুসরণ করতে লাগলো। এইভাবে একটানা প্রায় আড়াই ঘণ্টা পথ চলে বীরেশ হাঁপিয়ে উঠে কাতরস্বরে ডাকলো, "শায়লী !"

শায়লীর ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দ্রুত পদে তেমনি চলতে লাগলো। বীরেশ এবার চীৎকার করে উঠলো, "শায়লী, ও—শায়লী !" শায়লী হাসিমুখে এবার ফিরে তাকালো।

বীরেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "আর পারছিনে, শায়লী !—একটু বসো-না ছাই !"

বীরেশ আর উত্তরের অপেক্ষা করলো না। সে পিঠ হতে টুকরি নামিয়ে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লো। শায়লী বীরেশের ছেলেমানুষি দেখে মৃদু মিষ্টি হাসতে লাগলো।

"তা তুমি হাসতে পার শায়লী, আমি কিন্তু একটু বিশ্রাম না করে আর কিছুতেই হাঁটতে পারবো না।" বীরেশ ক্লান্তস্বরে বললো।

বীরেশের কথাগুলি শায়লীর মর্ম স্পর্শ করলো—আহা! শায়লা দাজুর এত দুঃখ, এত কষ্ট আজ কার জন্য ! একমাত্র তারই ক্ষণিকের নির্বুদ্ধিতার জন্যই তো আজ বীরেশের জীবনে দেখা দিয়েছে চরম ও ভয়াবহ সংকটকাল। শ্যামল সমতল বাংলার বুকে জন্ম যাদের, তাদের পক্ষে এই গহন অরণ্যের দুরারোহ পাহাড়ী পথ কষ্টকর তো হবেই।—শায়লী আর চিন্তা করতে পারলো না। চোখ দুটি তার অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। মাথার টুকরি ভূমিতে রেখে সে বীরেশের

সামনে এসে দাঁড়ালো এবং কাপড়ের আঁচল দিয়ে বীরেশের ঘামে-ভেজা মুখখানি মুছিয়ে দিলো।

"শায়লা দাজু তোমার পায়ে পড়ি—আর একটুখানি পথ হেঁটে চলো। এখানে বসে থাকা কিছুতেই চলবে না। পাশে ঝরনা—রাত দুপুর—গভীর অরণ্য। ওই দেখো, রাস্তার ধারে জংলী হাতীর দল সবেমাত্র মলত্যাগ করে গেছে। রাত্রিতে ঝরনার ধারে যত বন্য হিংস্র জীব-জানোয়ারের ভিড় জমে ওঠে। এখানে তোমাকে আমি কোনমতেই এমন নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সঁপে দিতে পারিনে। ওই যে বড় অশ্বত্থ গাছটা—ওইখানে চল। যদি আমাদের বিশ্রাম করতেই হয়, তবে গাছে বসে বিশ্রাম করতে হবে। রাত্রিতে অরণ্যে মাটিতে বসে বিশ্রাম করা কোনক্রমেই নিরাপদ নয়।" শায়লী-মিনতি-করুণ স্বরে কথাগুলি বলে বীরেশকে হাত ধরে টেনে তুললো। এবং ক্ষিপ্রহস্তে তার পিঠে থুক্কেটি তুলে দিয়ে নিজের টুকরিটি তাড়াতাড়ি পিঠে তুলে দ্রুতপদে সে অশ্বত্থ গাছটির দিকে চললো। বীরেশ সাধ্যমত শায়লীর পিছে চলতে লাগলো। অশ্বত্থ গাছটির তলায় কোন প্রকারে পৌছে বীরেশ টুকরিটি বৃক্ষতলে রেখে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো এবং শ্রান্ত কণ্ঠে বললো, "শায়লী বড় জল তেষ্টা পেয়েছে।"

"এত পরিশ্রমের পর এখনি ঠাণ্ডাজল খাওয়া হবে না, বিশেষ করে এই শীতের রাত্তিরে। আর তাছাড়া সঙ্গে জলও নেই। এখনই এই ঝরনায় জল আনতে গেলে প্রাণ নিয়ে ফেরা দায় হবে। তা থেকে বরং সঙ্গে গরম চা আর গরম দুধ আছে—তোমার যা ইচ্ছে, খেতে পারো।—কি খাবে বলো?" শায়লী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেশের দিকে চেয়ে রইলো। বীরেশ বিস্ময়-ভরা চোখে শায়লীর স্বেদ-মেদুর মুখের দিকে তাকালো—শায়লী কখন এ-সব সংগ্রহ করলো? শায়লী কি অন্তর্যামী?

"কি, চুপ করে রইলে যে? চট করে বল কি খাবে? বেশী দেরী করলে কোন বিপদ ঘটতে পারে; এটা তোমার বাঙলাদেশ নয়। এখানকার প্রকৃতি এই জায়গার অধিবাসীদের মতই দুর্বিনীত ও দুর্দান্ত। এখানে চারচোখ ছাড়া দুচোখে পথ চলা যায় না।—বল শীগ্‌গীরি।" শায়লী ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বললো।

"আচ্ছা, তবে চা-ই দাও।" বীরেশ বললো।

শায়লী আর দ্বিরুক্তি না করে ক্ষিপ্রহস্তে টুকরি খুলে চায়ের ফ্লাস্কটি বের করলো।

এমন সময় বীরেশ উৎসুককণ্ঠে বললো, "দেখো শায়লী, একপাল হরিণ এইদিকে ছুটে আসছে।"

শায়লী চেঁচিয়ে উঠলো, "সর্বনাশ! শীগ্‌গীরি গাছে ওঠ। এখনি হয়ত ওই হরিণগুলোর পিছু পিছু কোন হিংস্র জানোয়ার এখানে ছুটে আসবে।"

শায়লী আর বাক্যব্যয় না করে চায়ের ফ্লাস্কটি গলায় ঝুলিয়ে তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে লাগলো। গাছে উঠে সে হস্ত প্রসারিত করে ডাকতে লাগলো, "শায়লা দাজু, এদিকে এসো। এই যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।"

বীরেশ দ্রুত জুতা পায়ে উঠতে যেয়ে পড়ে গেলো। শায়লী নিজের কোমরে জড়ান কাপড় খুলতে খুলতে ভীত কণ্ঠে বললো, "শীগ্‌গীরি পায়ের জুতা খুলে ফেলো—শীগ্‌গীরি!"

তারপর শায়লী তার খোলা কাপড়ের অগ্রভাগ নীচে ঝুলিয়ে দিলো। বীরেশ কোন প্রকারে বস্ত্র-প্রান্ত ধরে উপরে উঠলো। আস্তে আস্তে আরো উপরে উঠে ওরা বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় নিলো।

এর মধ্যে ওই হরিণদল উত্তর দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে অশ্বত্থ গাছটির তলে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে শায়লী ও বীরেশ যে পথে এসেছিলো সেই পথে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বীরেশ আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "শায়লী, এর মানে? হঠাৎ হরিণগুলো ওমুখো ছুটলো যে?"

"নিশ্চয়ই কোন বিপদের কারণ রয়েছে দক্ষিণ দিকে।" শায়লী একটু চিন্তিত হয়ে উত্তর দিলো।

ঘটলোও তাই। শায়লীর কথা শেষ হতে না হতে যে স্থানে বীরেশ একটু আগেই পা ছড়িয়ে বসেছিলো ঠিক সেই জায়গায় একটি বিপুলকায় চিতাবাঘ দক্ষিণ দিক হতে লাফিয়ে পড়লো। এবং গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো। তারপর প্রায় মুহূর্তমধ্যে জানোয়ারটি যেদিক থেকে এসেছিলো, সেইদিকেই ছুটে পালিয়ে গেলো। বীরেশ সবিস্ময়ে বললো, "একি! বাঘটি যেদিক থেকে এলো, আবার সেই দিকেই পালালো যে!"

"চুপ কর, শায়লা দাজু! আমি আর কথা বলতে পারছিনে। এক্ষুনি ঐ বাঘের চেয়ে কোন ভীষণতর হিংস্র জানোয়ার এখানে এসে হাজির হবে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমাকে আজ আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি।" শায়লী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে থেমে গেলো।

ওর বক্ষস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত হতে লাগলো। সারা দেহ শীতের নিশীথেও ঘামে সিক্ত হয়ে উঠলো। একটা অজানা বিপদের আশঙ্কায় শায়লীর চোখে মুখে নিবিড় ভয়-বিহ্বলতা। বীরেশ আর তাকে বিরক্ত করলো না। শায়লীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে স্তব্ধভাবে বসে রইলো।

এমন সময় ভীষণ গর্জনে বন-তল প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। বীরেশ সজোরে বৃক্ষের একটি শাখা জড়িয়ে ধরে ভীতকণ্ঠে ডাকলো, "শায়লী!"

শায়লী তাড়াতাড়ি ডান হাতখানি বাড়িয়ে বীরেশের হাতখানি ধরলো এবং বাম হাতে গাছের একটি ডাল শক্ত করে ধরে ও বললো, "কোন ভয় নেই, শায়লা দাজু! এই তো আমি তোমার পাশেই রয়েছি।"

"এ বনে সিংহ আছে?" ক্ষীণস্বরে বীরেশ বললো।

"না, তবে মাঝে মাঝে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' দেখা যায়। আমার মনে হচ্ছে, এ গর্জন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের তবে যে জানোয়ারই আসুক না, আমরা তার আক্রমণের বাইরে। যদিও আমরা চার ডালের খোঁড়লে রয়েছি তবু পাশের ডালখানা খুব শক্ত করে ধরো, শায়লা দাজু! জানো তো, সাবধানের মার নেই।" শায়লী নীচুগলায় বললো।

আবার সেই ভীষণ গর্জন! এবার গর্জন ঘন ঘন হতে লাগলো এবং খুব নিকটে—অশ্বত্থ গাছটি হতে প্রায় কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে। একটি সুবৃহৎ কুম্ভের তলদেশ হতে যেন এই গুরুগম্ভীর নাদ গুমরে গুমরে বেরুচ্ছে। মুখের সম্মুখ থেকে শিকার ছুটে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত শার্দুল যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতি গর্জনে শুব্ধ নিশীথিনী যেন কেঁপে উঠছে। চতুর্দিকের নিদ্রিত অরণ্য যেন কেঁদে সহসা জেগে উঠেছে। পাশের গাছের বানরের দল কিচির মিচির শব্দ করতে করতে বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে ছুটে পালাচ্ছে। বৃক্ষ-শাখার পাখীগুলি উড়ে চলে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তরে। নিম্নভূমিতলে অসাধারণ চঞ্চলতা। পাশের জঙ্গল হতে এক পাল শূকর প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। ঝরনার অপর পারে একদল বন্যকুকুর ও বাইসন লেজ খাড়া করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। চারিপাশের অরণ্য জুড়ে যেন একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠলো। শায়লী ও বীরেশ এক হাতে ডাল এবং অপর হাতে পরস্পর-পরস্পরকে দৃঢ় বাহুবন্ধ করে বিস্ময়-বিমূঢ়ের ন্যায় বৃক্ষ-কোটরে বসে রইলো। একটু পরেই ব্যাঘ্ররাজ গজেন্দ্রগমনে অদূরে জঙ্গল হতে বেরিয়ে এলো। চাঁদের আলোকে বীরেশ তা স্পষ্ট দেখতে পেলো। সে ভয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, "বাপরে, কি প্রকাণ্ড বাঘ!"

শায়লীও অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলো! কতবার তো এইপথে তারা মামাবাড়ী গিয়েছে—এত বড় বাঘ তো সে-ও কোন দিন এ পথে দেখেনি। তবু বীরেশকে সে অভয় দিয়ে বললো, "ভয় কি, শায়লা দাজু? আমরা অনেক উপরে রয়েছি।" বীরেশ বৃক্ষশাখার ফাঁকে ফাঁকে বিচ্ছুরিত অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখলো, সহসা শায়লীর মুখমণ্ডল হতে কোথায় যেন ক্ষণ-পূর্বের ভয়-বিহ্বলতা কর্পূরের মত উবে গেছে। আর সেইখানে বিরাজ করছে দুঃসাহসিক বন্য কাঠিন্য।

ধীরে ধীরে শার্দুলরাজ তাদের অশ্বত্থ গাছটির তলে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ

বৃক্ষতলে বসে নীরবে লেজ নেড়ে তারপর সেটি উঠে যেখানে চিতাবাঘটি পায়ে মাটি খুঁড়েছিলো, সেখানে গিয়ে সেই জায়গাটি শুঁকতে শুঁকতে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো।

শায়লী ফিস্ ফিস্ করে বীরেশকে বললো, "শায়লা দাজু, শক্ত করে ডালটি ধরো কিন্তু। মনে হচ্ছে, জানোয়ারটা এখনি আবার চেঁচিয়ে কান ফাটাবে।"

বীরেশ ও শায়লী বানরের মত গাছের ডাল্ এক হাতে আঁকড়ে ধরলো এবং অপর হাতে উভয় উভয়কে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজলো। আবার গর্জন! আগের মতো বার বার; উর্ধ্ব আকাশে আষাঢ়ের মেঘ যেন বজ্রনির্ঘোষে ডেকে উঠলো। বন-ভূমি আবার কেঁপে উঠলো ত্রাসে।

ক্ষণেক পরে ব্যাঘ্ররাজ তার রণদামামা বন্ধ করলো এবং যে পথে হরিণগুলি ছুটে পালিয়েছিলো, সেই পথে বিজয়ী রাজেন্দ্রের মত মন্থর পদে প্রস্থান করলো।

"বাঁচা গেল।" শায়লী হাঁপ ছেড়ে বললো।

"বাঁচবে কি করে? হয়তো এখনি আবার কোন বিপদ জুটে যাবে।" বীরেশ বিবর্ণ মুখে বললো।

"না, অন্ততঃ আজ রাতে আর বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। আশেপাশের যোদ্ধার দল সব পালিয়েছে। আর একটা বড় উপকার শার্দুলরাজ করে গেল। সেটা হচ্ছে, যদি কোন অদৃশ্য শত্রু আমাদের পিছু নিয়ে থাকে এই অরণ্যের পথে, তবে সে আর এর পর অন্ততঃ কয়েক দিনের মত এদিক ভয়ে মাড়াবে না।" মৃদুহেসে শায়লী বললো।

বীরেশেরও হাসবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস দেখা গেলো, কিন্তু সে-হাসি তার ওষ্ঠপ্রান্ত অতিক্রম করলো না।

"ওঃ—হো! তোমার না জল পিপাসা লেগেছে, শায়লা দাজু? চা খাবে না?" ক্ষণকাল নীরব থেকে শায়লী বললো। বীরেশের বিষণ্ণ নয়ন সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

"ভালকথা মনে করিয়ে দিলে। আমার কিন্তু ওকথা মোটেই খেয়াল ছিল না। ...দেখো, আমার জিব্‌টা তালু অবধি শুকিয়ে গেছে। তাইতো কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি।" অতি মৃদুস্বরে বীরেশ বললো।

শায়লী ফ্লাস্কটির মুখ খুলে বীরেশের হাতে দিলো। সে আস্তে আস্তে সমস্ত চাটুকু নিঃশেষে পান করলো। তারপর খালি ফ্লাস্কটি সে শায়লীর হাতে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটি বের করে একটি সিগারেট ধরালো এবং ধীরে ধীরে সিগারেটটি টানতে লাগলো। এমন সময় তার খেয়াল হলো যে,

শায়লীর জন্য একটুও চা রাখা হয়নি। সে প্রায় চীৎকার করে উঠলো, "শায়লী, তোমার চা?"

"না, আমার এত রাত্তিরে চা খাবার প্রয়োজন নেই। আর আমার তো তোমার মত জল পিপাসা পায়নি।" শায়লী বললো।

"না, তা কিছুতেই হতে পারে না। নিশ্চয়ই তোমার তেষ্টা পেয়েছে। আমি তোমার ওকথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না। এত পরিশ্রমে, এত উত্তেজনায় মানুষের পিপাসা না লেগেই পারে না। আমি পুরুষ মানুষ, আমারই তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল; আর তুমি তো মেয়ে মানুষ।—বড় ভুল করেছি, বড় ভুল করেছি···।" উত্তেজনায় বীরেশ থেমে গেল।

"শায়লা দাজু, কি পাগলামি করছো। যদি নিতান্তই পিপাসা লাগে, নীচে ত টুকরিতে গরম দুধ রয়েছেই। এনে খাওয়া যাবে'খন।" শায়লী বললো।

"কিন্তু কি করে এখন নীচে নামবে? নীচে নামাও যা, আর বাঘের পেটে যাওয়াও তা—একই কথা।" বীরেশ বললো।

"শায়লা দাজু! ভুলে যাচ্ছ কেন, চা বাগানের শান্ত আবহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা তোমার লক্ষ্মী ছাত্রী মায়া আর আমি নই। সে মায়াকে তুমি পিছনে ফেলে এসেছ। আজ আমি শায়লী, পরিপূর্ণ শায়লী—পাহাড়ী মেয়ে—গিরিকন্যা। আমরা বাঘের পেটে যাই নে—আমরা বাঘের পিঠে যাই।" বিপুল আত্মশক্তিতে শায়লীর চোখ হতে বিদ্যুৎ যেন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগলো। বীরেশ অপলক নেত্রে শায়লীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। প্রকৃতই সে মুখে যেন এক স্বতঃ উৎসারিত শক্তির প্রচণ্ড লীলা, যা স্মরণাতীত কালের দেবদারু-বনচারিণী মহাশক্তিশালিনী গিরি-কন্যাকেই মনে করিয়ে দেয়। বীরেশ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলো।

আবার তাদের মাঝে নীরবতা যেন নিটোল হয়ে উঠলো। বীরেশ আনমনে সিগারেটে একটা টান দিলো।

"শায়লী, আজ আমি তোমার কাছে পরাজিত।" ধীরে ধীরে বীরেশ বললো।

শায়লী ফিক্ করে হেসে ফেললো। "নিশ্চয়ই, একশো একবার পরাজিত। আমি যে পাহাড়ী মেয়ে; আমাদের দেখে বনের পশু নতশিরে পথ ছেড়ে দেয়—আর তুমি ত ভেতো বাঙালী।" শায়লী হাসতে হাসতে বললো।

"বটে!" বীরেশ মৃদু হাসলো। তারপর মন্থর কণ্ঠে বললো, "আমি তো তোমার কাছে এ রকম পরাজয়ই অন্তরে অন্তরে চেয়েছিলাম, শায়লী! এ পরাজয়ে লজ্জা নেই, গ্লানি নেই,—আছে আনন্দ। যেমন আলেকজেণ্ডারের বিজয়গৌরব পুরুকে ম্লান করেনি।"

"উপমাটা ঠিক হলো না, শায়লা দাজু! পুরু কোনদিনও আলেকজেণ্ডারের রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করতে যাননি; বরং আলেকজেণ্ডারই এসেছিলেন পুরুর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত করতে এবং তা করেওছিলেন। কিন্তু তুমি এসেছিলে আমাকে তোমার শিক্ষা ও সভ্যতা দিয়ে পরাজিত করে বাঙালী বানাতে। আজ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তুমি আমার কাছে সত্যিই পরাজিত। তোমার ধুতি চাদর কেড়ে নিয়ে আজ আমি তোমায় নেপালী সুড়ুল পরিয়েছি। তোমার কলম ফেলে দিয়ে তোমার হাতে নেপালী জাতির প্রতীক তার ভুজালী দিয়েছি। বাঙলার শ্যামল সমতল বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে এনেছি। ধীরে ধীরে আরো অনেক বিষয়ে তোমাকে পাহাড়ী করতে হবে।—আজ কেমন জব্দ! হিঃ হিঃ হিঃ।" শায়লী কপট হাসিতে ভেঙে পড়লো।

বীরেশ একটুখানি হেসে অকারণে গম্ভীর হয়ে উঠলো এবং যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললো, "হে গিরিকন্যা। মোর লহ নমস্কার। হে দেবি, পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা কর।"

শায়লীও ততোধিক গাম্ভীর্য নিয়ে হস্ত প্রসারিত করে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় বললো, "তথাস্তু।"

পরে উভয়ে হাসতে হাসতে এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়লো।

আকাশের চাঁদ বনানীর শিরে ঝুঁকে পড়েছে। বীরেশ ও শায়লী পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর শায়লী নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, "না, আর এমন করে বসে থাকা চলে না। নীচু থেকে থুঞ্চে দুটো এখন উপরে তুলে আনতে হয়। আর রাত্তিরও প্রায় শেষ হয়ে এলো। এর পর একটু ঘুমোনোর ব্যবস্থাও তো করতে হবে।"

"সে কি! গাছে কি করে ঘুমুবে?" বীরেশ অবাক হয়ে শায়লীর দিকে চাইলো।

"সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এখন একটু চুপ করে বসে থাক দেখি।" বলে শায়লী আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামতে লাগলো। বীরেশ শায়লীর বস্ত্রাঞ্চল সজোরে টেনে ধরে চীৎকার করে উঠলো, "না, তা হবে না। আমি পুরুষ মানুষ হয়ে এখানে কাপুরুষের মত চুপ করে বসে থাকবো; আর তুমি একা একা নীচে নামবে—না, তা হতে পারে না, আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

বীরেশের মুখমণ্ডলে কাঠিন্য দেখা দিলো।

শায়লী মৃদু হেসে বললো, "ওগো বংশীধারী, এ যুদ্ধে তোমার অস্ত্রধারণ

করার প্রয়োজন হবে না। তুমি অনায়াসে বৃক্ষশাখায় বসে তোমার বাঁশরী বাজাতে পার।"

"তোমার এ যুক্তি অচল। কারণ আজ তুমি আমার হাতে বাঁশি দাওনি, দিয়েছ অসি। তাই আমায় অসির ধর্মই পালন করতে হবে।" বীরেশ আরো দৃঢ় হস্তে শায়লীর বস্ত্রপ্রান্ত ধরে রইল।

"মাগো মা! তোমার সঙ্গে তর্কে পারে কার সাধ্য। চল, তবে দুইজন এক-সাথেই নীচে নামি।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

শায়লী ও বীরেশ থুঞ্চে দুইটি ভূমি হতে তুলে এনে পাশের বৃক্ষশাখায় বেঁধে রাখলো। তারপর টুকরি হতে শায়লী একটি দড়ির জাল বের করলো। ঐ জালটির প্রান্তস্থ দড়ি দিয়ে চারিদিকের ডালের সঙ্গে জালটি সে শক্ত করে বাঁধলো। তারপর একটি ভুটিয়া কম্বল ওই বিস্তৃত জালের উপর নিপুণ হস্তে পেতে দিয়ে শয্যা রচনা শেষ করে শায়লী বীরেশকে তার উপরে বসতে ইঙ্গিত করলো। মুগ্ধ বীরেশ নীরবে শায়লীর নির্দেশ পালন করলো। তারপর শায়লী টুকরি হতে দুধের ফ্লাস্কটি বের করে শূন্য চায়ের ফ্লাস্কটিতে—বীরেশের নিষেধ সত্ত্বেও—অর্ধেকের বেশী দুধ ঢেলে ফ্লাস্কটি বীরেশের হাতে দিলো। তারপর এদিক ওদিক টুকটাক কাজ শেষ করে তারা দুজনে মুখোমুখি বসে দুধ পান করলো। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে শায়লী তিন গাছা দড়ি টুকরি থেকে বের করে প্রথম গাছি দিয়ে বীরেশের কোমর শক্ত করে বেঁধে তার অপর প্রান্ত পাশের ডালে বেঁধে দিলো। এবং এ কাজটি সে এমনভাবে করলো যাতে ওঠার, বসার এবং পাশ পরিবর্তনের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। অপর একগাছা দড়ি দিয়ে অনুরূপভাবে সে নিজের দেহও বৃক্ষশাখায় বাঁধলো। এরূপভাবে উভয়ের দেহ বৃক্ষশাখার সাথে বাঁধা হলো, যাতে ঘুমের ঘোরে গড়িয়ে তাদের কেউ যেন মাটিতে পড়ে না যায়। তারপর টুকরি হতে বড় ভুটিয়া কম্বলখানি বের করে সে শয্যায় রাখলো। এবং সর্বশেষে তৃতীয় দড়িগাছি দিয়ে নিজের মাজার সঙ্গে সে বীরেশের কোমর এরূপ করে বাঁধলো যাতে একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে না পড়ে যায়। ক্ষিপ্রহস্তে শায়লী সমস্ত কাজ শেষ করে বীরেশের পাশে এসে বসলো। সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ওর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে বেরিয়ে এলো। পথশ্রম ও উত্তেজনার অবসানের পর শায়লীর সারা দেহ নিদারুণ অবসাদে ভারি হয়ে আসছিলো।

সমস্ত বনানী রজনীর নিবিড় নিঝুমতায় ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। বীরেশ অবাক হয়ে শায়লীর ক্রিয়াকলাপ যতই দেখছিলো ততই মুগ্ধ হচ্ছিলো। শায়লীই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে বললো,— "শায়লা দাজু, রাত্তির প্রায় শেষ হয়ে এলো।

এসো, এখন ঘুমানো যাক।” বীরেশ আর দ্বিরুক্তি না করে শয্যায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। শায়লী ধীরে ধীরে ভুটানী কম্বলখানি নিজের ও বীরেশের আপাদ-মস্তকে তুলে দিয়ে বীরেশের পাশেই শয়ন করলো।

বীরেশ সস্নেহে ডাকলো, “শায়লী!”

“কি বলো?” মৃদুকণ্ঠে শায়লী উত্তর দিলো।

“সত্যিই শায়লী, তোমাকে আজ কী যে ভাল লাগছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যতই তোমায় দেখছি ততই তুমি রূপে গুণে আমার চোখে মহিয়সী হয়ে উঠছো। বল তো শায়লী! আজ তোমায় কি নামে ডাকি? কি নামে ডাকলে, আজ তোমার প্রকৃত নামকরণ হবে?” স্নেহকোমল কণ্ঠে বীরেশ বললো।

“মহিয়সী না ছাই! তুমি আমায় এখন থেকে রাক্ষসী বলে ডেকো, শায়লা দাজু! আর তাই হবে আমার ঠিক নাম।” শায়লী চাপা কান্নায় দু হাতে চোখ ঢাকলো।

“ছিঃ! কেন মিছি মিছি কাঁদছো, শায়লী?” শায়লীর কেশে মৃদু হস্ত সঞ্চালন করতে করতে বীরেশ বললো।

“তুমি যা-ই বল-না কেন, শায়লা দাজু, আমি এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি নে যে, আমার ক্ষণিকের ভুলই আজ তোমায় মৃত্যুর দুয়ারে এনে হাজির করেছে। কেবল আমার জন্যই তোমার যে এই অজ্ঞাত বনবাস শুরু হলো, জানি নে—এর কবে শেষ হবে। এ দুর্গম পথে মৃত্যু আমাদের প্রতি পদক্ষেপে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। তুমি বাংলার ছেলে। তুমি মুখ ফুটে না বললেও, আমি এটা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করছি—তোমার পক্ষে এই পাহাড়ী পথ চলা কত কষ্টকর; আর তোমার এই দুর্গতির মূলে রয়েছি আমি।...শায়লা দাজু! কেন তুমি আমায় অমন বুকভরা ভালবাসা দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে? কেন তুমি আমায় গ্রহণ করতে দিয়েছিলে উন্নত জীবনের স্বাদ? তুমি আমার জীবনে এমন করে দেখা না দিলে আমি চা বাগানের শতকরা নিরানব্বইটি পাহাড়ী মেয়ের মত চা বাগানের সাহেবের ছুকরী হওয়াটাই সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতাম। আর তাহলে তো আমি তোমার আকাশে কুগ্রহের মত এসে জুটতামও না।” কান্নায় শায়লীর কণ্ঠস্বর বার বার রুদ্ধ হয়ে আসছিলো।

“শায়লী, অকারণ তুমি নিজের উপর দোষারোপ করে কষ্ট পাচ্ছ। আমি যা করেছি তা নিতান্ত কর্তব্যের তাগিদেই করেছি। তোমার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয়নি।” বীরেশ শান্ত কণ্ঠে বললো।

শায়লী এবার বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"শায়লা দাজু! মিথ্যে আমায় এমন প্রবোধ দেবার চেষ্টা করো না। তুমি যদি সেদিন তোমার নিছক কর্তব্যই করে থাক, তবে শায়লীকে আশীর্বাদ কর, যেন সে নির্মম কর্তব্যের নিষ্প্রাণ গণ্ডি পেরিয়ে যেখানে মানুষের অন্তর ক্রিয়াশীল, সেইখানে দাঁড়িয়ে তার সব কিছু করণীয় আজ অন্তর দিয়ে করে যেতে পারে। শায়লা দাজু, তোমার ইস্কুল মাষ্টারের চোখ কি শুধু কর্তব্যের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত প্রাণহীন যন্ত্র মানুষটাকেই দেখতে অভ্যস্ত? ওই গণ্ডির বাইরে যে প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, ভুল-ভ্রান্তি-ভরা যে বিচিত্র প্রাণবান মানুষ রয়েছে, সে-মানুষ কি তোমার চোখে পড়ে না?"

রাগে ও কান্নায় মানিনী শায়লী থেমে গেল, দু গাল বেয়ে শুধু অশ্রুবিন্দু ঝরতে লাগলো। আহত কপোতীর মত শায়লী ভুটিয়া কম্বলে মুখ লুকালো।

বীরেশ নীরবে অস্তমান চন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলো। শায়লীর একটি কথারও জবাব সে দিতে পারলো না। যেন যুগান্তকারী একটা সুপ্তির পর হঠাৎ জেগে উঠে সে আজ সবিস্ময়ে দেখলো—তার সেদিনের পৃথিবী যেন আজ অনেকখানি বদলে গেছে। তার ভাব-জগৎ আজকার ভাবের সঙ্গে একটা অসঙ্গত অসঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে। বীরেশের চিন্তা-জগতে শায়লীর কথাগুলি ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সে ভাবতে লাগলো, বাস্তবিক সে কি রূপ-বৈচিত্র্যময় মানুষকে দেখেনি? যদি সে দেখেও থাকে, তবু বোধহয় সে তাকে চেনেনি। যুগ-যুগান্তরের অন্ধ সংস্কারের সবুজ চশমা পরে সে সব কিছুই হয়তো সবুজ দেখেছে। নইলে শায়লী তাকে আজ এমনভাবে আঘাত করলো কেন? সত্যই কি সে কোনদিন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে শায়লীর দিকে তাকিয়েছে? না, এই দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে সে দেখলো তাকে শুধু ওই ইস্কুল মাষ্টারেরই চোখে? বীরেশ অতীতের পানে ফিরে তাকালো—না, সেখানে ইস্কুল মাষ্টার ব্যতীত ক্বচিৎ কখনো কখনো শায়লা দাজুকেও দেখা যায়। এই দুইজন ছাড়া আর কাউকে এর আশে পাশে খুঁজে পাওয়া যায় না। শায়লীর কথা মোটামুটি ঠিকই বটে; কিন্তু সে আজ কি করবে? সে যে শিক্ষক, শায়লী যে ছাত্রী! তার শিক্ষা, তার সংস্কৃতি, তার সমাজ তাকে যে আর বেশীদূর অগ্রসর হবার অধিকার দেয়নি। তার আজন্মের সংস্কার আজ মুহূর্তের মধ্যে সে কি করে ভুলে যাবে?—শায়লী কি বলতে চায়? কোন্ চোখে ওকে দেখতে হবে? প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার চোখে?—না না না, তা হতে পারে না। কর্তব্যের কঠিন নিগড়ে যে পশুকে সে এতদিন বেঁধে রেখেছে, তাকে আজ তথাকথিত প্রাণবান মানুষের বাসনা-কামনার উচ্ছৃঙ্খলতায় ছেড়ে দিতে পারে না—তা শায়লী যা-ই বলুক।

বীরেশের দৃষ্টি শায়লীর ঘুমন্ত মুখের উপর পড়লো। ঘুমের ঘোরে ওর মুখের উপর থেকে কখন যেন কম্বলের প্রান্ত খসে পড়েছে। অস্ত-চন্দ্রের ক্ষীণ আভা বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ওর বেদনা-ম্লান মুখের পর পড়েছে। ওর শ্বেত কমলের মত সাদা ফুটফুটে মুখখানিতে যেন নিশি-পদ্মের স্নিগ্ধ পাণ্ডুর শ্রী। বীরেশ অপলক নেত্রে ক্ষণকাল ওই মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কেমন যেন একটা দুর্বলতা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগলো। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভিতরের সেই ইস্কুল মাষ্টার জেগে উঠলো। বীরেশ তাড়াতাড়ি শায়লীর দিকে পিছন ফিরে শুলো।

সাত

প্রভাতের আলো বনের গহনে পৌছতে একটু বিলম্বই হয়। ওদের শয্যায়-নেমে-আসা বিলম্বিত প্রত্যুষে জেগে শায়লী দেখলো, বীরেশ শীতে ঈষৎ জড় সড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। গভীর অসতর্ক ঘুমে বীরেশের দেহ থেকে কম্বলখানি পড়ে গেছে। নৈশ সমীরণে বৃক্ষের জীর্ণ পাতাগুলি শয্যার এদিকে ওদিকে পড়ে রয়েছে। শায়লী পাতাগুলি কুড়িয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেললো। তারপর অতি সন্তর্পণে সে বীরেশের গায়ে কম্বলখানি তুলে দিয়ে চারধার সযত্নে গুঁজে দিলো। হঠাৎ শায়লীর নজর পড়লো বীরেশের পথ-শ্রান্ত মুখের উপর। সতৃষ্ণ নয়নে সে চেয়ে রইলো সেই মুখখানির দিকে। তার মনে হতে লাগলো, এই দুর্গম পাহাড়ী পথে ভারবাহী পশুর মত চলা—না জানি কত কষ্ট হচ্ছে শায়লা দাজুর! এমন সময় ওই গাছের শাখা-চ্যুত একটি পাতা ঘুরতে ঘুরতে—পড়বি তো পড়—একেবারে শায়লীর বাম গালের মাঝখানে এসে পড়লো। খানিকটা সাদা কষে ওর পেলব গণ্ডদেশ চিহ্নিত হয়ে উঠলো। শায়লী মৃদু হেসে আচলের প্রান্ত দিয়ে গাল মুছে চায়ের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে নীচে নামতে লাগলো।

বীরেশের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন প্রভাতের অরুণিমা বনতরুর জমাট পাতার আবরণ ভেদ করে ভূমি স্পর্শ করেছে। জেগে বীরেশ তার পাশে শায়লীকে না দেখে চেঁচিয়ে ডাকলো "শায়লী!"

"এই যে আমি নীচে, চা করছি। তোমার মুখ ধোবার জল ফ্লাস্কে করে তোমার পাশেই ডালে বেঁধে রেখেছি। আর তোমার টুকরিটার উপরে দেখো, টুথপেষ্ট আর ব্রাশ বের করে রাখা আছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নেমে এসো। চা প্রায় হয়ে এলো।" সর্বনিম্নের বৃক্ষ-কোটরে বসে চায়ের জল ফুটাতে ফুটাতে শায়লী বললো।

বীরেশ নেমে আসতেই শায়লী বললো, "ফ্লাস্কটি এনেছ?—না না থাক। আমারই এখন উপরে যেতে হবে। তুমি ততক্ষণ এখানে একটু চুপচাপ বস তো?

শায়লী স্পিরিটের শিশিটি হাতে করে উপরে উঠতে লাগলো। কিছুপরে ফ্লাস্কটি ও ছোট টিফিন কেরিয়ারটি হাতে করে সে নীচে নেমে এলো। ফ্লাস্কটা পাশে গাছের ডালে বেঁধে রেখে সে টিফিন কেরিয়ারটি খুলে চিঁড়েভর্তি একটা

বাটি বীরেশের হাতে দিলো। কেটলি থেকে ফুটন্ত জল খানিকটা সেই বাটিতে ঢেলে দিয়ে সে বললো, "নাও, চিঁড়েগুলো ধুয়ে ফেলো।"

তারপর চিঁড়েভরা অপর একটি বাটি নিয়ে তাতে গরম জল ঢেলে সে ধুতে লাগলো। ধোয়া শেষ হলে উভয় বাটিতেই অল্প অল্প চিনি দিয়ে সে বীরেশকে বললো, "শায়লা দাজু! তুমি খেতে থাক, আমি ততক্ষণ চা বানিয়ে নি। এদিকে ষ্টোভের তেল পুড়ে যাচ্ছে।"

"না, তুমি চা তৈরি শেষ করো। পরে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।" বীরেশ বললো।

শায়লী জবাব না দিয়ে ষ্টোভ নিভিয়ে দিলো। এবং ক্ষিপ্রহস্তে চা প্রস্তুত করে ফ্লাস্ক দুইটি পূর্ণ করলো। তারপর নিজের বাটিটি হাতে তুলে নিয়ে সে বীরেশকে খেতে ইঙ্গিত করলো।

চিঁড়া খাওয়া শেষ হলে, শায়লী ও বীরেশ মুখোমুখি বসে চা পান করতে লাগলো। বীরেশ বিস্ময়-ভরা চোখে শায়লীকে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা শায়লী, তুমি কি সমস্ত সংসারটি পিঠে করে এই নিরুদ্দেশের যাত্রায় বেরিয়েছ?"

"বনবাদাড়ে নূতন ঘর বাঁধতে যাচ্ছি। এসব না নিয়ে কি করি, বলো?" শায়লীর ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুক-ভরা দুষ্টু হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

বীরেশ যেন তা দেখেও দেখলো না; শুধু স্মিত মুখে সে বললো, "তুমি যেমনভাবে দু হাতে কাজ করে যাচ্ছ, তাতে আমি যে শীগ্‌গীরি বেকার হয়ে পড়বো, শায়লী!"

"আমার সংসারে সে-ভয় থাকবে না। যার যার মত সবারই কাজ থাকবে; সবাই ভাত পাবে। যে কাজ করবে না, সে ভাতও পাবে না। আমি এদিক থেকে পুরোপুরি সাম্যবাদী।" একটু হেসে শায়লী চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিলো।

"তা তো বুঝলাম।" এক চুমুক চা পান করে বীরেশ বললো।

"তবে আর এত ভাবনা কিসের?" শায়লী তেমনি হেসে বললো।

"কিন্তু তুমি আমায় যে রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে আমার যোগ্য কি কাজ-ই বা আছে? না আছে মাষ্টারি, না আছে ডাক্তারি। কারণ আমি ভুটানী ভাষা জানিনে, তাই মাষ্টারি অচল; আর ওষুধ-ও মিলবে না, ফলে ডাক্তারি চলবে না। অবশেষে হাল-চালনা আর গো-রাখালি দিয়ে পাকাপাকিভাবে আমায় 'গোরখালি' বানাবে না কি?" বীরেশ মৃদু হেসে আবার চায়ের পাত্রে চুমুক দিলো।

এবার শায়লী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

"প্রয়োজন হলে চালাবে বইকি। আমাদের জনক রাজাও তো হাল চালাতেন আর দীলিপ রাজাও তো কত গরু চরাতেন।" শায়লী আবার তেমনি হাসতে হাসতে ঢলে পড়লো।

"হায় ভগবান! এই ছিল কপালে।" বীরেশ কপট গাম্ভীর্যে কপালে করাঘাত করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।

শায়লী এবার হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো।

বীরেশ নীরবে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটি বের করে ধীরে ধীরে একটি সিগারেট ধরালো। কয়েকবার সিগারেটটি সজোরে টেনে একগাল ধোঁয়া শায়লীর মুখের উপর ছেড়ে দিলো।

"এই আবার তোমার দুষ্টুমি শুরু হলো বুঝি?" বলে শায়লী চায়ের পাত্রে শেষ চুমুক দিলো।

চা পান শেষ করে শায়লী চায়ের সরঞ্জামগুলি নিয়ে আবার উপরে উঠলো এবং জিনিসগুলি একে একে টুকরিতে তুলে রাখলো। আর বীরেশ ভাবালস নয়নে পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল গতিতে ছুটে-আসা গিরি-নির্ঝরের দিকে তাকিয়ে তার কলকল্লোল শুনতে লাগলো।

ইতিমধ্যে শায়লী কোমরে খুঁকরী* বেঁধে একটি ডাঁটহীন ছোট কুঠার ও একগাছি দড়ি হাতে করে ঠিক বীরেশের পিছনে এসে একটি ছোট ডাল ধরে দাঁড়ালো।

"তোমার এখনো চা খাওয়া শেষ হয়নি?" শায়লী বললো।

"এই হলো।" বীরেশ ভাবমন্থর দৃষ্টিতে শায়লীর দিকে ফিরে চেয়ে এক নিঃশ্বাসে বাকি চাটুকু শেষ করলো। তারপর কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে বললো "হুজুরের কি হুকুম?"

"হুজুরের হুকুম—তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে নীচে নামতে হবে।" শায়লী হেসে বললো।

"তারপর?" বীরেশ নত মস্তকে বললো।

"তার পরের হুকুম, তারপর হবে।" শায়লী বললো।

"যে আজ্ঞা।" বীরেশ তেমনি মাথা নত করে বললো।

শায়লী হাসতে হাসতে নীচে নামতে লাগলো। বীরেশ অনুগতের মত ওকে অনুসরণ করলো। শায়লী নামতে নামতে চট্ করে পাশের ডালে হাতের দড়িগাছি বেঁধে সড়্ সড়্ করে দড়ি ধরে গাছের তলায় নামলো। বীরেশ ক্ষণকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে শায়লীর দিকে চেয়ে রইলো।

"বাবা গো! এ যে ভানুমতীর খেল্!" পরে হাসতে হাসতে বীরেশ বললো।

"ভানুমতীর নয়—এ চন্দ্রমায়ার খেল্।" তলায় দাঁড়িয়ে শায়লী বললো।

---

*খুঁকরী—ভুজালী।

"তা বটে, এ মায়া কাননে মায়ারই তো খেলা হবে। তা তোমার এ কয় নম্বরের খেল, মায়া?" বীরেশ বললো।

"খেলের এখনি হলো কি? এসব তো বেনম্বরী খেল। নম্বরী খেল আসতে আসতে তুমি কি আর মানুষ থাকবে, শায়লা দাজু?—একেবারে ভেড়া বনে যাবে।" শায়লী হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো।

"তার কিছু কিছু প্রমাণ এর মধ্যেই পাওয়া গেছে, শায়লী। বৃক্ষ-শাখে বাসা বেঁধে নরত্ব থেকে বানরত্বে তো নেমেই গেছি, অর্থাৎ পশুত্বের অর্ধ পথে। সুতরাং বাকি পথ যেতে যেতে পুরোপুরি পশু বনে যাব—এতে আর বিচিত্র কি!" গম্ভীরভাবে বীরেশ কথাগুলি বললো। তারপর শায়লীর দিকে চেয়ে হোঃ হোঃ করে খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসলো। শায়লী কথা বললো না কোন, শুধু হাসলো।

"হয়েছে, হয়েছে, তত্ত্ববাগীশ মশায়। এখন তত্ত্বকথা রেখে লক্ষ্মী ছেলের মতো ওই দড়িগাছি ধরে সুড় সুড় করে নীচে নেমে পড়ুন দেখি।" শায়লী ক্ষণকাল নীরব থেকে বললো।

বীরেশ দড়িগাছি ধরে বার কয়েক এদিক ওদিক তাকালো। পরে দড়িটি একবার কপালে ঠেকিয়ে "জয় মা!" বলে ঝুলে পড়লো।

শায়লী বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে শুধু খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো। বীরেশ মাটিতে নেমে জামা কাপড় ঠিক করতে করতে বললো, "বাপ! বাঁচা গেলো!"

"মাগো, নিরীহ স্কুল মাষ্টারের পেটে এত বিটলেমিও ছিল।" শায়লী হাসতে হাসতে বললো।

"পেটে তো অনেক কিছুই ছিল। এখন সুযোগ পেয়ে সব কিছুরই ক্রমবিকাশ হচ্ছে—বুঝলে, শায়লী? যাকে বলে কিনা 'ইভলিউশন'। এই ধরো-না—প্রথম ছিলাম মাষ্টার, তারপর ডাক্তার, তারপর ডাকাত (লোকে বলে), তারপর বনচারী-নর, আর বর্তমানে বানর, অর্থাৎ এখনও দ্বিপদ আছি। এর পর তুমি বলছ—হব নাকি ভেড়া! তার মানে চতুষ্পদ—একেবারে 'গ্রাণ্ড সাক্সেস্ ইন্ লাইফ'! গম্ভীরভাবে বলে বীরেশ একটি সিগারেট ধরালো।

শায়লী বললো, "এটা ক্রমবিকাশ হলো—না, ক্রমসঙ্কোচন?"

"আরে, অত তর্ক করলে কি পারি? একটা কিছু হলো তো? ওকেই আজকালকার ছেলেমেয়েরা বলে 'ইভলিউশন'।" বীরেশ বললো।

"তোমার আজকালকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা দেখছি।" শায়লী বললো।

সিগারেটে সজোরে একটা টান দিয়ে বীরেশ শায়লীর দিকে চেয়ে শুধু একবার

মৃদু হাসলো। শায়লী ক্ষণকাল শূন্যদৃষ্টিতে সামনের জঙ্গলের দিকে চেয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে সেদিকে যেতে লাগলো। বীরেশ পিছন থেকে আঁচল ধরে টেনে ওকে থামিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো, "তা হচ্ছে না—কিছুতেই নয়। তোমাকে একা এ জঙ্গলে কিছুতেই ঢুকতে দেবো না।"

"কোন ভয় নেই। কাল রাত্তিরে যে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে, আজ আর একটি প্রাণীও এর আশে পাশে সারাদিনে দেখা যাবে না।" বীরেশকে অভয় দিয়ে শায়লী মৃদু হাসলো।

"তোমার কোনরূপ স্তোকবাক্য আমি শুনতে চাইনে, শায়লী! মোট কথা আমি তোমাকে একাকী এ-জঙ্গলে কিছুতেই যেতে দেবো না।"—বীরেশ ঘাড় বাঁকিয়ে আপত্তি জানালো।

"আচ্ছা, চল তবে দুজনেই যাই।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

অল্পক্ষণ পরে শায়লী ও বীরেশ একটি লম্বা পাকা বাঁশ কেটে জঙ্গল হতে টেনে বের করে আনলো। এবং উভয়ে সেটি ধরাধরি করে এনে রাখলো অশ্বত্থ গাছের তলায়। তারপর ক্লান্তদেহে তারা পাশাপাশি বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। তাদের মাঝে নীরবতা নিবিড় হয়ে উঠলো।

শায়লীই নীরবতা ভঙ্গ করলো। "এক্ষণে তত্ত্ববাগীশ মহাশয় বৃক্ষতলে বসিয়া ক্ষণকাল তাম্রকূট সেবন করুন। চন্দ্রমায়া কাষ্ঠ আহরণে যাইতেছে।"

"যে আদেশ, ভদ্রে!" বীরেশ মস্তক অবনত করে গম্ভীরভাবে বললো। পরে শায়লীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে আর না হেসে পারলো না। শায়লী হাসতে হাসতে ভুজালী হস্তে প্রস্থান করলো।

বীরেশ পকেট থেকে আবার একটা সিগারেট বের করে ধরালো। সিগারেটটি খুব কয়েক বার টেনে আনমনা সে গতি-চঞ্চল নির্ঝরের ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে রইলো।

জীবনের আবর্তে হারিয়ে যাওয়া ফেলে-আসা কয়েকটি দিন—যৌবনের স্বপ্ন দিয়ে মোড়া কয়েকটি সোনার মুহূর্ত ভেসে ওঠে আজো তার মানসপটে। সেই কলেজ, যার প্রাসাদোপম দ্বিতল অট্টালিকার প্রতিখানা ইটে আজো লেগে রয়েছে মহাত্মা কেরীর স্পর্শ। অট্টালিকা ঘিরে কলেজের নিখুঁত নিটোল অঙ্গন-উদ্যান। ছোটবড় কত না উদ্যান-বীথিকা। মাঝে মাঝে ছোটখাটো ঝোপঝাড়—লতাকুঞ্জ না থাকলেও কুঞ্জ-প্রায় নিরালা। ওপারে—গঙ্গার অপর পারে লাট সাহেবের বাগান-বাড়ীর ঘাট দেখা যায়। দূর হতে দূরান্তরে পাড়ি-জমানো ওপারের বাঁধানো রাজপথ দেশান্তরে ছুটে চলে। উদ্যান বীথি, পথতরু ও বৃক্ষশ্রেণীর

আড়ালে আবছায়া-ঢাকা আর একটি প্রাসাদ-চূড়া চোখে পড়ে। জ্যোৎস্না-ধোয়া মৌন নিশিতে দুই পারের দুই পুরী যেন স্বপ্ন-সুষমায় জেগে ওঠে। মাঝে বয়ে যায় জোয়ার-ভাটা-ভরা হুগলী নদীর কল্লোলিত জলরাশি—মানুষের জীবনের সুখ দুঃখের মত।

রজনী গভীর হয়। ঝাউ গাছের মাথাগুলো ঝির ঝির করে কেঁপে ওঠে। ওরা কথা কয় যেন অস্ফুট ভাষায়। নিষুতি রাতের মৃদু সমীরণে ভেসে আসে, উড়ে যায় সেই কথা। যার শুনবার মত কান আছে, সে শোনে; যার বুঝবার মতো মন আছে-সে বোঝে। বীরেশও বোঝে। কতদিন সে শুনেছে সেই কথা নিথর নিশীথে তাদের কলেজের শান-বাঁধানো ঘাটে বসে। নিমগ্ন অতীত যেন আজ উঠে আসে—উঠে আসে ওই ভাগীরথীর জোয়ারের মত আলোড়িত হয়ে। ভুলতে পারে না বীরেশ ; মনে পড়ে আজও তার কলেজের সহপাঠী বন্ধুদের—সেই বঙ্কিম, মাধব ও কালীকৃষ্ণকে। তেমনি মনে পড়ে তার সেদিনের বান্ধবীদের—ঋতা, চিত্রা ও পুষ্পালীকে ; বিশেষ করে ঋতা বিশ্বাসকে, যে তার স্বপ্ন-সরোবরে একটি বিশিষ্ট শতদল। আরো কত কিছু মনে পড়ে। মনে পড়ে একটি স্বপ্নময়ী সন্ধ্যা। উৎসব-মুখর সন্ধ্যা নেমে আসে ওদের কলেজ প্রাঙ্গণে—college social। কণ্ঠসঙ্গীতে ঋতা প্রথম, বীরেশ দ্বিতীয়। ওস্তাদী গানে বীরেশ প্রথম, ঋতা দ্বিতীয়। আবৃত্তি—বীরেশ প্রথম, ঋতা দ্বিতীয়। ঋতা আবৃত্তি করেছিল 'দেবতার গ্রাস', আর বীরেশ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।' আজ কোথায় সেদিন! কোথায় সে জীবন! বীরেশ ভাবে আর ভাবে, ভাবতে ভাবতে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, আজো যদি সে যায় সেই কুঞ্জবীথিকায়, জীবনের হারিয়ে-যাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষায়-ভরা শ্রেষ্ঠ দিনগুলি হারিয়ে খুঁজে পাবে ; খুঁজে পাবে ঋতার শেষ বিদায়ের অশ্রুবিন্দু।

আজ বীরেশ সেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বনের গহনে বসে দেখছে। প্রভাত-সূর্যের সোনার কিরণ ওর বুকে পড়ে বিচ্ছুরিত মুক্তার ফুল সৃষ্টি করে ছুটে চলেছে। সত্যই যেন আজ নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙেছে। তাই সে মুক্তির আনন্দে মেতে উঠেছে। তার চারিদিকের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করে সে ছুটে চলেছে মহামুক্তির আস্বাদনে অনন্ত জলধি-জলে। অথচ নিজে সে?—সে চলেছে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে সেই পাষাণ-প্রাচীরেই বুঝি বন্দী হতে। জাগ্রত পৃথিবী ছেড়ে বুঝি সে চলেছে মহা প্রসুপ্তির দেশে। অব্যক্ত বেদনায় বীরেশের দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে এলো। সিগারেটে একটা টান দিয়ে মৃদুমন্থর স্বরে সে আবৃত্তি করতে লাগলো—

"হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও ।।..."

এমন সময় ফিরে এলো শায়লী। ওর কাঁধে অনেকগুলো শুকনো ডাল। "মাগো, এর মধ্যেই কবিত্ব আরম্ভ হয়েছে! তোমাকে নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়লাম, বাপু! তোমার সাহিত্যচর্চাটা অন্ততঃ আরো দুটো দিন বন্ধ রাখতে পার? ভুলে গেলে চলবে কেন, শায়লা দাজু, এটা হিমালয়ের দুর্গম গিরি-পথ? এখানে তন্ময় হয়ে বসে বসে কবিত্ব করলে পিছন থেকে ব্যাঘ্র মহাশয় এসে যে ঘাড় মটকাবে।" শায়লী কাঠগুলি মাটিতে রেখে রোষের ভান করে বললো। তারপর খুঁকরীখানি বীরেশের হাতে দিয়ে স্মিতমুখে বললো, "বলি কবি-সম্রাট! এখন একটু অ কবির কাজ করুন। এই বাঁশটি চেঁচেছুলে এই কুড়োলটির একটি ডাঁট লাগানোর চেষ্টা করুন। আমি উপর থেকে এক্ষুনি আসছি।"

শায়লী গাছের ডালে ঝুলানো দড়ির সাহায্যে উপরে উঠে গেল। আর বীরেশ মন দিয়ে বাঁশের গ্রন্থিগুলি ফেলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে শায়লী তৈলসিক্ত মাথায় গলায় গামছা জড়িয়ে নীচে নেমে এলো। "ওঃ হোঃ! শায়লা দাজু, একটা ভুল হয়ে গেছে। তোমার খুঁকরীটি নিয়ে আমার সাথে এসে তো একটু।" বলে শায়লী একটি বাঁশঝাড়ের দিকে যেতে লাগলো। বীরেশ নীরবে শায়লীকে অনুসরণ করলো।

এই বাঁশগুলি ফাঁপা ও হালকা। শায়লী তিন কোপে একটি বাঁশ কেটে ফেললো। পরে উভয়ে ধরাধরি করে বাঁশটি গাছতলায় নিয়ে এলো।

"তুমি বাঁশের গিরেগুলো ফেলতে থাকো, আমি ততক্ষণে স্নান সেরে আসি।" শায়লী মন্থর পদে ঝরনার দিকে চলে গেল।

বীরেশ আপন মনে তার কাজ করতে লাগলো। স্নান শেষ করে কাপড় রৌদ্রে মেলে দিয়ে শায়লী বৃক্ষ হতে রন্ধনের যাবতীয় উপকরণ নীচে নামালো। তারপর প্যানে করে চাল ডাল ঝরনার জলে ভাল করে ধুয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে রাঁধার কাজ আরম্ভ করলো।

"যাও, শায়লা দাজু, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। এগারটার মধ্যেই আমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখানে বেশী দেরি করলে পথে বিপদ ঘটতে পারে। এ পথ আরো জংলা—আরো দুর্গম।" শায়লী বললো।

বীরেশ অতি দ্রুত স্নান সারলো। তার পর গাছে উঠে কোট, কামিজ, নেপালী সুড়ল ইত্যাদি পরে ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে নেমে এলো। "বাঃ, চমৎকার! এর মধ্যে সব শেষ করে ফেলেছো? এইতো এবার কাজের মানুষ হয়ে উঠেছো। নাও, এবার কুড়োলের ডাঁটটি লাগিয়ে ফেলো। তবে ডাঁটটি একটু বড় করে রেখো কিন্তু।" শায়লী আবার নিজের কাজে মন দিলো।

শায়লীর কুঠারটি ছোট কিন্তু ধনুকের মত বাঁকানো এবং শানিত মুখ। ডাঁট লাগিয়ে শায়লীকে দেখতে দিলো। শায়লী কুঠারটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললো, "হাঁ, হয়েছে। এবার এই বাঁশটি হাত আড়াই করে চারটি টুকরা করে ফেলো। আমি ততক্ষণ পাশের জঙ্গল থেকে ভাত খাবার পাতা কেটে আনি। আমার রান্না তো প্রায় হয়ে এলো। এদিকে একটু নজর রেখো।"

শায়লী খুঁকরী হাতে জঙ্গলে ঢুকলো। বীরেশ নিজের কাজ করতে লাগলো।

পাতা নিয়ে শীঘ্রই শায়লী ফিরে এলো। পাতা ধুয়ে দু পাতে সে খিচুড়ি ঢেলে দিলো। ইতিমধ্যে বীরেশ কাজ শেষ করে গম্ভীরভাবে বললো, "দেবি, আর কি আদেশ?"

বীরেশের বলার ভঙ্গী দেখে শায়লী হেসে উঠলো।

"এবার ফ্লাস্কে করে কেট্‌লী থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে খেতে বসতে হবে।" শায়লী হাসিমুখে বললো।

"জো হুকুম, বিবিসাহেবা।" বীরেশ মাথা নত করে বললো।

"আমি এখনও বিবি হইনি, সেটা খেয়াল আছে?" শায়লী বললো।

"ও—তা বটে। কিন্তু মুসলমানী ভাষায় কুমারীর প্রতিশব্দ কি হবে? তা যে জানিনে ছাই।" বীরেশ মৃদু হেসে বললো।

"আমি কি মুসলমান, যে আমাকে মুসলমানী ভাষায় ডাকবে? নেপালী ভাষায় বরং ডাকতে পার।" শায়লী দস্তুরমত প্রতিবাদ করলো।

"ও বাবা, তোমার দেখি ভাষাতেও আপত্তি।" ফিকে হাসির রেখা বীরেশের ওষ্ঠ-প্রান্তে দেখা দিলো। সে ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলতে লাগলো, "দেখো শায়লী, জাত-ধর্ম—এটা যেন ছুত-স্পর্শ ব্যাধির মত আমাদের পিছু পিছু ছুটে চলে। এই ধর্ম নিয়ে হানাহানি মধ্যযুগে এক সময়ে চলেছিল পাশ্চাত্য দেশে। কিন্তু আজ আমরা বিংশ শতাব্দীর মধ্যে বসেও সেই ধর্মের নামে বর্বরতা চালাচ্ছি। ভারতের পথে-ঘাটে এখানে-সেখানে বর্তমানে চলেছে ক্ষুদে ধর্মযুদ্ধ। ভারতভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠলো। আর সব চেয়ে দুঃখের বিষয়, এই সব দুষ্কৃতকারীদের পিছনে দাঁড়িয়ে উস্কানি দিচ্ছে দুই সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। আমরা এখন হিমালয়ের গভীর অরণ্যে বৃক্ষতলে বসে আছি। এখানে মানুষ নেই, সমাজ নেই, সভ্যতা নেই। মানুষের তৈয়ারী আইনকানুন—সব কিছু বাধা-নিষেধের বাইরে এখন আমরা। আমাদের আজ এই ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ধরণীর চারিধারে চাইলে মনে হয়—আমি ও তুমি, পৃথিবীর আদিমতম নর ও নারী; প্রকৃতির আদিম ক্রোড়ে যেন বসে রয়েছি। আমাদের নিশির শয্যা পাতা রয়েছে

এখনো বৃক্ষের শাখায়। কিন্তু এখানেও আমাদের পিছু ধাওয়া করেছে সেই সমাজের ভয়—সেই ধর্মের গোড়ামি! এখানেও আমরা মানুষের মহিমা দিয়ে মানুষকে বিচার করতে দ্বিধা করি।" বীরেশ থামলো। তার কণ্ঠ বেদনায় করুণ হয়ে আসছিলো।

শায়লী নীরবে কাজ করে যাচ্ছিলো। কাজ শেষ করে সে ধীরে ধীরে বললো, "এর জবাব অবসর সময়ে দেওয়া যাবে, শায়লা দাজু। হিংস্র জানোয়ারভরা এই অরণ্যের গাছের তলে বসে সমাজ-বিচার নিরাপদ নয়। এবার তুমি শীগ্গীরি খেয়ে নাও দেখি। আমি উপর থেকে এক্ষুনি এলাম বলে।" চুল্লিতে চায়ের জন্য এক কেটলি জল চাপিয়ে শায়লী ক্ষিপ্রগতিতে গাছে উঠতে লাগলো।

বীরেশের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে, এমন সময় শায়লী গাছ থেকে নেমে এলো। বীরেশ মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখলো—শায়লী শাড়ী ছেড়ে নেপালী সুড়ল পরেছে। দেহের নিম্নার্ধে সম্পূর্ণ পুরুষের বেশ, উপরে অবশ্য মেয়েলী পোশাকই রয়েছে—সেই পটুকা (কোমরে বাঁধবার কাপড় বিশেষ), সেই সেমিজ, চৌলী (লম্বা হাতাওয়ালা ব্লাউজ), মুজেত্রা (মাথায় বাঁধবার বড় রুমাল) এবং হাতে রুমাল —সবই স্ত্রী-সাজ।

বীরেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বললো, "একি! হরগৌরীর বেশে রণে চললে নাকি?"

শায়লী মৃদু হেসে বললো, "কি আর করি বল। তুমি তো হরের পার্ট ঠিক মত করতে পারছো না। আমাকেই প্রকৃতপক্ষে দুই কাজই চালাতে হচ্ছে। তাই সাজে ও কাজে এক হয়ে নিলাম। আর যে পথে আমরা চলেছি, তাতে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ তো শুরু হতে পারেই। যাক্‌গে, তোমার খাওয়া শেষ হলো? এই কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগে শেষ ভাত খাওয়া। বাকি দীর্ঘপথ চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে যেতে হবে। আমরা পাহাড়ী, একাদিক্রমে সাতদিনও চিঁড়ে খেয়ে পথ চলতে পারি; কিন্তু তোমরা ভেতো বাঙালী কিনা, তোমাদের নিয়ে পাহাড়ী পথে আমাদের হয় জ্বালা। তাইতো আমাকে আবার বন-বাদাড়ে রান্না করতে হলো।

শায়লী আর বিলম্ব না করে ঈষৎ হেসে আহারে বসে গেল।

"তুমি উপর থেকে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে আন, শায়লা দাজু! আমি ততক্ষণে খেয়েনি। বেশী দেরি করো না যেন; যাবার বেলা প্রায় হয়ে এলো।" শায়লী খেতে খেতে বললো।

আহার শেষ করে বীরেশ গাছ হতে দড়ির সাহায্যে থুঞ্চে দুইটি, দড়ির জাল ইত্যাদি সব কিছু নীচে নামালো। তারপর আস্তে আস্তে অশ্বত্থ বৃক্ষ হতে নেমে এসে বীরেশ ভূমি-তলে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে শায়লীও আহার শেষ করে ঝরনার

জলে হাতমুখ ও বাসনপত্রাদি ধুয়ে গাছের তলায় এনে রাখলো। ধীরে ধীরে সে তার চৌলীর পকেট হতে একটি স্বপারী বের করে খুঁকরী দিয়ে কেটে অর্ধেকটা বীরেশকে দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজের মুখে ফেলে দিলো। উনান হতে কেটলি নামিয়ে ফ্লাস্ক দুটি ভরে চা প্রস্তুত করলো। পরে সে ঝরনার জলে কেটলি ধুয়ে এক কেটলি জল নিয়ে গাছের তলায় ফিরে এলো এবং নিপুণ হস্তে টুকরি দুইটি সাজাতে লাগলো। টুকরি দুইটি নিখুঁতভাবে সাজানো হয়ে গেলে, শায়লী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "শায়লা দাজু, এখন কটা বাজে?"

বীরেশ শায়লীর টুকরি হতে তার 'এটাচিকেস'টি এনে সেটি খুলতে খুলতে বললো, "কাল ভোরে জঙ্গলে বসে ঘড়িতে চাবি দিয়েছিলাম। তারপর তো আর দেখিনি। কি জানি ঘড়ি চলছে কিনা।"

'এটাচিকেস'টি খুলে বীরেশ হাত ঘড়িটি বের করে উল্লসিত হয়ে বললে, "চলছে, চলছে—এখনো চলছে!"

"কটা বাজে?" শায়লী জিজ্ঞাসা করলো।

"এগারটা বাজতে পনরো মিনিট বাকি।" বলে বীরেশ 'রিস্টওয়াচ'টি হাতে বাঁধলো এবং 'এটাচিকেস'টি বন্ধ করে আবার টুকরির উপরে রেখে দিলো।

"চল, মিনিট পনেরো গাছে উঠে বিশ্রাম করি।" শায়লী বললো।

"আবার গাছে কেন?" বীরেশ বললো।

"এটা হলো জংলী কানুন। নীচে থাকার প্রয়োজন যখনই শেষ হবে, সেই মুহূর্তেই গাছে উঠতে হবে। যে রাজ্যের যে নিয়ম তা অবশ্য পালন করতে হবে।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

তারা বৃক্ষে উঠে নিম্ন শাখায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলো।

শায়লী ধীরে ধীরে বলতে লাগলো "এসো, শায়লা দাজু! তোমার প্রশ্নের জবাব দি। তুমি জাত-ধর্মের কথা বলছিলে না? আচ্ছা, ভিন্ন ধর্মের কথা ছেড়ে দাও, আগে নিজের জাতের কথাই বলা যাক। 'জাত' মানে আমি এখানে একই হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার কথা বলছি। দেখো, এই একই হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত জাত রয়েছে। বিধর্মীরা বলে থাকে, হিন্দুদের ছত্রিশ কোটি দেবতা আর ছত্রিশ কোটি জাত। হয়তো তারা উপহাস করে বলে। কিন্তু কথাটি কি মিথ্যা? শাস্ত্র পুরাণে যেমন দেব-দানবে মারামারি, তেমনি আমরা দেখতে পাই—বড় জাতের সঙ্গে ছোট জাতের লড়াই, অনেকটা ওই দেবাসুরের মত। আজ আমাদের সামনে অপর ধর্মের কেউ একটি মুচির ছেলেকে মেরে যাক, আমরা বলবো —বেশ করেছে, শালা মুচি জুতোখোরের জাত, জুতো মারাই উচিত। তেমনি

একটি ব্রাহ্মণকে যদি অন্য ধর্মের কেউ মারে, তখন মুচি বলবে—বেটা বাউনকে মেরেছে, ঠিক করেছে। ওর টিকিটা ছিঁড়ে দিল না কেন? বেটা মন্দিরের বারান্দায় পর্যন্ত যেতে দেয় না আমাদের। তেষ্টা পেলে জল চাও, জল তো দূরের কথা, টিকি নেড়ে বলবে—এই ছুঁলি, এই ছুঁলি। দেবতা যেন বেটার বাপের সম্পত্তি—আমরা যেন কুকুরের অধম। ধর্মে ধর্মে যখন মারামারি লাগে, তখন আমরা পরম বৈষ্ণব—আমাদের আচণ্ডালে প্রেম জেগে ওঠে, কিন্তু যেই বিপদ কেটে যায়, অমনি আবার সেই 'ছুঁলি ছুঁলি' রব।

"তারপর এর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে প্রাদেশিকতার সমস্যা। বাঙালী বিহারীকে বলবে ছাতুখোর—মেড়ো ভূত। তেমনি যুক্তপ্রদেশের হিন্দুরা বাঙালীকে ঘৃণাভরে বলবে—বাঙালী মছ্‌লিখোর ইত্যাদি। আবার তেমনি তোমরা বাঙালীরা আমাদের বলো—নেপালী জংলী ভূত, অসভ্য, বর্বর—আরো কত কিছু; যদিও আমরা উচ্চ শ্রেণীর নেপালীরা বাঙালীদের চেয়ে স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে হীন নই। অথচ আশ্চর্য! আমরা নেপালীরা কিন্তু তোমাদের ঘৃণা করিনে, যেটা করা হয়তো উচিত ছিল।

"ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় মহারাজ ভীম শাম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা যখন নেপালের প্রধান মন্ত্রী, তখন তিনি তাঁর রাজ্যে বাঙালীদের সাথে নেপালী মেয়েদের বিবাহাদি ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তিনি চেয়েছিলেন নেপালীর শৌর্যের সঙ্গে বাঙালীর বুদ্ধির সংমিশ্রণ, যাতে নেপালে একটি অভাবনীয় শক্তিশালী জাতি গড়ে ওঠে।...এই ধরো না, তুমি যে এত মহাজন-বাক্য আওড়াচ্ছ, তোমার ঘরেই কি একটি নেপালী মেয়ের স্থান হয়? ধর, তোমার সমপর্যায়ের কোন এক নেপালী মেয়েকেই যদি তোমাকে বিয়ে করতে বলা হয়, তাতে সম্মতি দিতে পারবে? যেমন তুমি বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে কায়স্থ শ্রেণীর লোক, তেমনি নেপালী সমাজে ছত্রী কায়স্থের স্থান অধিকার করে আছে। আজ যদি কোন শিক্ষিত, সুন্দরী ছত্রীর মেয়ে—যাকে তুমি মানুষের মহিমা দিয়ে বিচার করলে অগ্রাহ্য করতে পারো না—তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, পারবে তুমি তার প্রার্থনা পূর্ণ করতে? সেই নিষ্পাপ নেপালী তরুণীর শুভ্র সবল হাতখানি যদি তোমার হাতে তুলে দেওয়া যায়, শায়লা দাজু, পারবে তুমি তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই হাতখানি ধরতে?"

শায়লী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বীরেশের শুভ্র প্রশান্ত মুখখানা ও কান দুটো সহসা রক্তাভ হয়ে উঠলো। সে একটি 'টু' শব্দ করতে পারলো না। শুধু অদূরের ঝরনায় ফেনিল জলরাশির দিকে চেয়ে রইলো। নীরবতা নিবিড় হয়ে উঠলো তাদের মাঝে।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করে শায়লী আবার বললো,—"শায়লা দাজু, এই যে

আমরা যে-বৃক্ষে বসে আছি, তার একটি শাখায় আঘাত কর, অন্য শাখায় তার শিহরণ উঠবে। কিন্তু এই বিরাট হিন্দুসমাজ যেন বিশাল একটি মৃতদেহ, এর এক অঙ্গ ছেদন করলেও, অপর অঙ্গে তার স্পন্দন জাগে না! বিদেশী গজনীর মামুদ যখন সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করলো, তাই তখন সেই মন্দির রক্ষার জন্য লক্ষ হাতে লক্ষ কৃপাণ অপূর্ব লাক্ষা-রাগে ঝলসে ওঠেনি। তোমরা হয়তো বলবে—হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি—হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ ও হিন্দুদর্শন সর্বত্র প্রশংসিত। কিন্তু সেই শাস্ত্রের বাণী যদি সমাজের সকল স্তরে সমভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তবে সেই শাস্ত্রের কচ্‌কচিতে সাধারণ মানুষের কি এসে যায়? সাধারণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে চায় সমাজে তার উপযুক্ত স্থান। তাই বলি, শায়লা দাজু, নিজের ধর্মের শাখায় শাখায় যে অন্ধ গোঁড়ামি যুগ যুগান্তর থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তা আগে ঝাঁটিয়ে সমাজ থেকে দূর করে দাও। তারপর পরধর্মের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক গোঁড়ামি আছে, তার উপর নজর দিলে কাজ হবে।"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শায়লী থামলো। আবার তাদের মাঝে নীরবতা ঘনীভূত হয়ে উঠলো। সহসা ব্যগ্রভাবে শায়লী জিজ্ঞাসা করলো,—"শায়লা দাজু, সময় কত?"

"এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে।" বীরেশ বললো।

"না, আর এক মিনিট-ও দেরি করা চলবে না। গল্পে গল্পে অনেক সময় নষ্ট হলো। ও, ভাল কথা, ঘড়িটায় চাবি দিয়ে নাও। অনেক সময় গভীর বনে ঘড়ি না থাকলে আন্দাজে সময় ঠিক করা যায় না।" বলতে বলতে শায়লী নীচে নামলো।

ঘড়িতে দম দিয়ে বীরেশও অশ্বত্থ গাছ থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলো। শায়লী টুকরি হতে বীরেশের ক্যানভাসের জুতা জোড়া বের করে তাকে চামড়ার জুতা খুলে ঐ জুতাজোড়া পরতে বললো। নিজেও ক্যানভাসের জুতা পরতে লাগলো। কারণ তাদের নিঃশব্দ চরণে দুর্গম বনপথে চলতে হবে। শব্দ হলে হিংস্র বন্যজন্তুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। শায়লী মাথায় মুজেত্রার বাঁধন পুনরায় শক্ত করে এঁটে দিলো। বীরেশও মাথায় কাপড় দিয়ে পাগড়ি বেঁধে নিলো। শায়লীর পিঠে টুকরি তুলে দিতে দিতে বীরেশ বললো, "বাবা গো! তোমার থুঞ্চে যে ভারি প্রায় দেড় মণ। কি করে এত ভার পিঠে করে হাঁটছো, শায়লী?"

শায়লী শুধু মৃদু হাসলো। এবং বীরেশের পিঠে টুকরি তুলে দিয়ে সে পথ চলতে শুরু করলো। বীরেশের হাতে রইলো শানিত কুঠারটি; আর শায়লীর এক হাতে কেটলি ভরা জল এবং অপর হাতে সেই ধারালো বল্লমখানা, সূর্যের আলোকে সেটা ঝক্‌ঝক্ করছিলো।...আবার আরম্ভ হলো ওদের যাত্রা।

আট

পথে একবার বিশ্রাম করে শায়লী ও বীরেশের পরবর্তী আশ্রয়-স্থলে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে এই দুর্গম বনপথে একটি শম্বর ও একটি ক্ষুদ্রকায় চিতাবাঘ ছাড়া আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য হিংস্র জীব-জন্তুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। বিকাল পাঁচটার সময় তারা এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় এসে মন্থর পদে থামলো। বীরেশ পিঠের বোঝা ভূমিতে রেখে ধপ্ করে হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়লো এবং একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "বাবা! বাঁচলুম।"

"না, বাঁচার এখনো কিছু দেরি আছে। বোধহয় এর মধ্যে তোমাকে ঠাকুরদাকেও স্মরণ করতে হবে।" শায়লী হাসতে হাসতে তার পিঠের বোঝা বৃক্ষতলে রাখলো।

বীরেশও হেসে শায়লীর স্বেদ-সিক্ত মুখখানির দিকে তাকালো, যেখানে গোলাপী কপোল-তলে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তার মালা গেঁথে চলেছে।

"কয়টা বাজে?" শায়লী প্রশ্ন করলো।

"পাঁচটা পাঁচ।" বীরেশ বললো।

"না, না—আর এখানে এরকমভাবে বসে থাকা ঠিক হবে না। আমরা ভুটানের সীমান্তে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছি। এখানে আর একটু পরেই হিংস্র জন্তুর আনাগোনা শুরু হবে।...ওঠ শীগ্‌গীরি, শায়লা দাজু! এখনি আমাদের গাছে উঠতে হবে।" বলে শায়লী থুক্কের দড়ি ধরে উঠে দাঁড়ালো এবং বীরেশকে আগে গাছে ওঠার জন্য ইঙ্গিত করলো।

বীরেশ গাছে উঠে একটি একটি করে থুক্কে দুইটির দড়ি ধরে বৃক্ষের উপরে তুললো। আস্তে আস্তে শায়লীও গাছে উঠলো। বৃক্ষের অনেকটা উপরে উঠে একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ-কোটরের পাশের শাখায় শায়লী ও বীরেশ তাদের থুক্কে দুইটি বাঁধলো। তারপর শায়লী ও বীরেশ—উভয়েই তার অভ্যন্তরে আশ্রয় নিলো। এই বৃক্ষ-গহ্বরে তখনও কিছু বাদামের খোসা, অর্ধপীত বিড়ির টুকরা, কমলা লেবুর খোসা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এই বৃদ্ধ বট-বৃক্ষ যে কতদিন

হতে ভুটানগামী পথিকদের পান্থনিবাসের কাজ করে আসছে—তা কে জানে! বীরেশেরও তা বুঝতে অধিক বিলম্ব হলো না।

শায়লী ক্ষিপ্র হস্তে কোটরের আবর্জনা পরিষ্কার করে কেটলির জলে হাত ধুয়ে ফেললো। এবং ওর ভেতরে একখানা কম্বল পেতে দিয়ে সে বীরেশকে বসতে বললো। বীরেশ নিতান্ত অনুগতের মত বিছানো কম্বলখানায় বসে তার শ্রমকাতর দেহখানা বৃক্ষকাণ্ডে এলিয়ে দিলো।

এই বুড়ো বটগাছের একরূপ তল দিয়েই একটি ছোট গিরিনদী গর্জে চলেছে। গিরিনদী যেমন হয়—কোথাও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, আবার কোথাও অতি সঙ্কীর্ণ এবং সেইখানে জলের গতিবেগ এত তীব্র যে তার মুখে যে কোন জীব-জানোয়ারই পড়ুক না কেন, চক্ষের নিমেষে কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, চিন্তা করতেও ভয় হয়। সুপ্রাচীন এই বটবৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকার মাঝখানে, তাই এখানে নদীটি অনেকটা চওড়া হয়ে একটা কুন্ডের মত সৃষ্টি করে অদূরে একটি গিরি-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে সহসা একটি দুর্নিরীক্ষ্য পর্বত-গহ্বরে গিয়ে পড়েছে। এর আঁকাবাঁকা সর্পিল গতি-ভঙ্গী, বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলা জলস্রোতের সোঁ সোঁ শব্দ, গিরি-সঙ্কটের মুখে জলপ্রপাতের গর্জন—এসব দেখে-শুনে মনে হয়, বাসুকির কোন আহত মর্তবাসী বংশধর যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় গর্জে গর্জে উঠছে।

এই বৃদ্ধ বটের শাখাপ্রশাখা কোন কোন জায়গায় একেবারে নির্ঝরিণীর বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এর অপর পারে ভুটান রাজ্যের সীমানা নির্দেশক পিলার দেখা যাচ্ছে। এই নদীটি ভারত ও ভুটানের প্রাকৃতিক সীমারেখা।

শায়লী হাতের টুকটাক্ কাজ শেষ করে চায়ের ফ্লাস্কটি ও 'টিফিন কেরিয়ারে'র একটি বাটি নিয়ে বীরেশের সম্মুখে বসলো। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে খানিকটা চা নিজের জন্য ঢেলে রেখে বাকি সমস্ত চাটুকু ফ্লাস্ক ধরে সে বীরেশের হাতে দিলো। তারপর ওরা মুখোমুখি বসে চা পান করতে লাগলো। চা পানের আমেজের সাথে সাথে শায়লী বলতে লাগলো, "শায়লা দাজু! আমরা এখন এক বিচিত্র জায়গায় এসে পড়েছি। এখানে প্রতিপদে বিপদ ও বিস্ময় রয়েছে ওত পেতে। কখন যে কি অবস্থায় আমাদের কোন্ বিপদের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন! এ বনে চিতা, ডোরা (বাঘ), হাতী, ভল্লুক, শূকর, বুনো মোষ, বাইসন, এমনকি কোন কোন জায়গায় গণ্ডার পর্যন্ত দেখা যায়। এই দিলাম তোমায় এখানকার হিংস্র অধিবাসীদের খবর। এ ছাড়া কত যে নগণ্য হিংসুক

জীব-জন্তু রয়েছে, তাদের তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মোটকথা— ডুয়ার্স, আসাম ও ভুটান অঞ্চলে সচরাচর মানুষের সাথে যে সকল বন্য জানোয়ারের সাক্ষাৎ ঘটে থাকে, কপালগুণে তাদের প্রতিটির এক বা একাধিক স্যাম্পেলের সঙ্গে আমাদের দেখা হতে পারে।"

বলতে বলতে সহসা থেমে শায়লী চায়ের বাটিতে একটি চুমুক দিলো। বীরেশ তন্ময়াবিষ্ট নয়নে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

শায়লী আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, "এ-সব জানোয়ারের মধ্যে আমাদের এখন থেকে চিতা ও ভল্লুক সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এরা সুযোগ বুঝে মানুষকে গাছে উঠেও আক্রমণ করে। চিতা হলো ব্যাঘ্রকুলের নাপিত। সে যেমন ধূর্ত, আঘাত পেলে তেমনি হয় ভয়ঙ্কর। এমনও দেখা গেছে, চিতা সুযোগের অপেক্ষায় মানুষকে দুই তিন মাইল পথ অনুসরণ করেও আক্রমণ করেছে।"

শায়লী চায়ের বাটিতে আবার সজোরে চুমুক দিলো। বীরেশ চা পান শেষ করে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। কুণ্ডলীকৃত ধূম্রজাল মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে সে বললো, "তারপর তোমার ভালুক মশায়দের কি সমাচার?"

শায়লী মৃদু হেসে বলতে লাগলো, "ভালুক মশায়রা নিতান্তই মহাশয় প্রাণী। তারা সাধারণতঃ ফলমূল, পোকা-মাকড়, শস্যাদি আহারী পরম বৈষ্ণব, তবে বিপাকে পড়লে, খেয়াল মর্জি হলে, মশায়রা কিঞ্চিৎ মাংস খান বৈকি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?" বীরেশ শায়লীর বর্ণনার ভাষা শুনে হেসে উঠলো। শায়লী কিন্তু এবার স্বাভাবিকভাবে বলে চললো, "কিন্তুটা হচ্ছে—এরা আহারে অনেকটা বৈষ্ণব প্রকৃতির হলেও বিহারে এদের বৈষ্ণব প্রেম মোটেই দেখা যায় না। এরা ভীষণ হিংস্রক এবং কতকটা নির্বোধও বটে। ভালুক নানাভাবে মানুষকে আক্রমণ করে থাকে। ওরা মানুষকে যখন আক্রমণ করে, তখন সাধারণতঃ দু-পায়ে ভর করে মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মুখ দিয়ে ছিটোতে থাকে থুথু। সে-থুথু বিষাক্ত। সামনের দু-পা তুলে মানুষের হাতের মত নাচাতে নাচাতে এবং মুখে বিকট চীৎকার করতে করতে ভালুক মানুষের দিকে ছুটে আসতে থাকে। তার কুৎসিত মুখের ভয়াল চেহারা দেখে ও অদ্ভুত চীৎকার শুনে বহু শিকারী ঘায়েল হয়েছে— এমন প্রমাণ অনেক আছে। ভালুক সোজাসুজি কখনো শিকারকে মারে না। শিকারকে আধমরা করে ওর চলতে থাকে নিষ্ঠুর খেলা। শিকারের শরীরের নরম মাংসল অংশ ওর আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। তারপর উপড়ে ফেলে চোখ। তারপর তীক্ষ্ণ ধারালো নখ দিয়ে পেট চিরে ফেলে মজা দেখতে থাকে, যতক্ষণ না হতভাগ্যের মৃত্যু হয়। এইজন্য ভালুকের আক্রমণ অতি ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর। মধু ও আঁখ ওদের

সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। গায়ে ওদের অসীম শক্তি। কিন্তু ওদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কানেও ভাল শুনতে পায় না। অথচ ওদের ঘ্রাণশক্তি খুবই তীব্র। এই ঘ্রাণশক্তির দ্বারাই ওরা বিশেষভাবে চালিত হয়। ভালুক একা একা থাকতে ভালবাসে। তাই এদের দলবদ্ধভাবে খুব কম দেখা যায়। আগুন দেখে ওরা খুব ভয় পায়। ভালুক-শিকারের প্রথম উপদেশ হলো—ওকে দূর থেকে আক্রমণ বা আঘাত করতে নেই। কারণ ওর লোমশ শরীরে আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে শিকারীর জীবনও বিপন্ন হতে পারে। শিকারীকে ধৈর্য ও অসীম সাহসে ভর করে ভালুক নিকটে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শিকারী যদি বন্দুকধারী হয়, তবে ভালুকটি নিকটবর্তী হলে বন্দুকের নলটি ওর বুক লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরতে হবে। ভালুকের স্বভাবই হলো, সম্মুখে কিছু দেখলেই তা অবলম্বন করে সে দু-পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে এবং তখনই একে গুলি করতে হয়। আর শিকারীর যদি বন্দুক না থাকে, তবে যখন ভালুকটি তেড়েমেরে আসতে থাকবে, তখন লাঠি বা ওই রকম কিছু তার সামনে ধরতে হবে। যখন ভালুকটি লাঠি ধরে দাঁড়াবে, তখন ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার পেটে বা মুখে আঘাত করতে হবে। পেটে আঘাতই সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ পেটে আহত হলে ভালুকের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত।"

ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বীরেশ শায়লীর কথাগুলি শুনছিলো। "না, আর গল্প করা চলবে না। হাতের কাজগুলো শেষ করে ফেলা যাক।" শায়লী চা পান শেষ করে উঠে দাঁড়ালো।

সেই তরুশিরে উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করে শায়লী রাত্রির শয্যা-রচনায় মন দিলো। বীরেশ তাকে সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগলো। ওরা নিশার শয্যা-রচনা শেষ করে। তারপর থুঞ্চেস্থিত বাঁশের খণ্ডগুলি নিয়ে শয্যার চারধারে বৃক্ষের শাখায় এমনভাবে বেঁধে দিলো যেন প্রয়োজন হলে ওই বাঁশের টুকরোগুলির উপর দেহের ভর রেখে যে কোন শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। শয্যা পেতে শায়লী নীচে নেমে গেলো; বীরেশ ক্লান্ত দেহে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

ভুটানী পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এখনো সন্ধ্যা নেমে আসার কিছু বিলম্ব আছে, তবু এখন নীচে নামা নিরাপদ নয়। এতক্ষণে নিবিড় অরণ্যানীর বৃক্ষতল আস্তে আস্তে তরল অন্ধকারে ভরে উঠেছে। শায়লী ওর কেটলিতে দড়ি বাঁধলো এবং যে শাখাটি নির্ঝরিণীর বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, তাতে বসে সে সন্ধ্যার কাজ সমাপন করার জন্য জল তুলতে লাগলো। এদিকে বন-গহনের অধিবাসীদের মধ্যে কর্মব্যস্ততার সাড়া পড়লো। কোথাও হরিণী ডেকে উঠলো, কোথাও ডাকতে লাগলো বন্য কুক্কুটের দল,

বন-তরুর শাখায় শাখায় শুরু হল কত রকম নাম-না-জানা পাহাড়ী পাখীর কল-কাকলি। শায়লী আর দেরি না করে বৃক্ষ কোটরে বসে রাত্রির খাবার প্রস্তুত করতে লাগলো।

বীরেশ বৃক্ষের উপরতলায় দড়ির জালের বিছানায় জড়ের মত পড়ে রইলো। ক্রমে ক্রমে শায়লীর আজকের কথাগুলো তার মনের দুয়ারে ভিড় জমাতে লাগলো। বীরেশ ভাবতে লাগলো, গভীরভাবে। —তাইতো! শায়লী যা বললো, কথাগুলি স্থানে স্থানে রূঢ় হলেও তার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাকে অস্বীকার সে কি করে করবে? শাস্ত্রের বচন, মহাজন বাক্য, নেতাদের বাণী—এগুলি যদি মানুষের জীবনে রূপায়িত না হয়, তবে সে কথা, সে বাণীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া একদিন লোকসমাজে দেখা দেবেই—। তাইতো আমাদের দেশের অধিকাংশ সমাজপতি, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার এবং তথাকথিত নেতার দল আজ শুধু বচনবাগীশে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের কথা ও কাজের অসঙ্গতি শুধু তাঁদেরই দুর্গতি ডেকে আনেনি—এনেছে দেশেরও। কিন্তু দিন যে চলে যায় দিনান্তরে, রূপ পৌছায় রূপান্তরে। প্রত্যুষের পৃথিবীকে কি প্রদোষে খুঁজে পাওয়া যায়? একথা আমরা বুঝেও বুঝিনে—জ্ঞানে জানলেও প্রাণে গ্রহণ করিনে। রূপান্তর দেখলেই আমরা আঁতকে উঠি।

হিন্দু ধর্মের প্রাণচঞ্চল গণতান্ত্রিক উচ্ছল জীবন-ধারা স্বৈরাচারী সুবিধাবাদী সমাজপতিদের হাতে পড়ে আজ কূপ-পল্বলে পরিণত হয়েছে। সেদিনের সে উদার সমাজ—যাঁরা চার্বাকের মত বিরুদ্ধ মতবাদীকে পর্যন্ত সহ্য করেছেন, পরবর্তীকালে তাঁদেরই স্থলাভিষিক্তের দল অতি তুচ্ছ কারণে অমানুষিক নির্যাতন থেকে শুরু করে জাতি-পাতে এসে থেমেছে। এই আত্মসম্মান হানিকর বিধি মানুষ কতদিন সহ্য করতে পারে? তার ফলে ক্রমশঃ হিন্দু জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ হলো ধর্মান্তরিত। তবু সমাজপতিদের চৈতন্য হলো না। আজো হয়েছে কি? যে সমাজ সুদূর অতীত থেকে খালি বর্জনই করে এলো—বাহিরের একজনকেও গ্রহণ করতে পারলো না, তাকে বিলক্ষণ মৃতের সমাজই বলতে হবে। কারণ মৃতের ধর্মই সঙ্কোচন আর প্রাণের ধর্ম সম্প্রসারণ। হিন্দুর সমাজে আজ সে সম্প্রসারণশীলতা কই?

শায়লী ঠিকই বলেছে—এই বিরাট হিন্দু সমাজ যেন একটি অতিকায় শব! আর তাকে ঘিরে একদল ধাপ্পাবাজ সদাই হৈ-চৈ করছে যারা মানুষকে মানুষের মহিমা দিয়ে বিচার করে না। কিন্তু বীরেশ নিজে কি করে?—বীরেশ নিজের দিকে ফিরে তাকালো। এই যে শায়লী, যে আজ মূর্তিমতী মমতার ন্যায় তার

অনুগামী, কেবল তার ছাত্রী বলেই কি গ্রহণের অযোগ্য? নাকি গৃহে তার মাতা, ভগ্নী এবং সর্বোপরি তার উন্নততর বাঙালীর সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দম্ভই তাদের এই মিলনের পথে অন্তরায়? বীরেশ চোখ বুজে তার অন্তর্লোকে অনুসন্ধিৎসু নয়ন মেললো। মা, বোন, হয়তো মামারাও—বীরেশ ভাবতে লাগলো—কিছুতেই শায়লীকে তাঁদের গৃহকোণে এতটুকু স্থান দেবে না। শায়লী রূপবতী, শায়লী গুণবতী, শায়লী বুদ্ধিমতী; তবু সে নগন্য কুলীর মেয়ে বই তো নয়! তাকে বাঙালী পরিবার কিছুতেই সহ্য করবে না। কিন্তু পরক্ষণেই বীরেশের মনে হলো—আজ তার জীবন নাট্যের যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেখানে তাঁদের স্থানই বা কতটুকু? তার বর্তমানে বয়স ত্রিশ ধরো ধরো। তার সঙ্গে দ্বাদশ বৎসরের অজ্ঞাত বাস যোগ করলে বয়স গিয়ে দাঁড়াবে চল্লিশের পরপারে। সেই সুদূর ভবিষ্যতে—ততদিন যদি সে বেঁচে থাকে—ফিরে এসে সেই বাঙলার ছায়াশীতল গাঁয়ে আবার নূতন করে ঘর বাঁধা।—তাও কি সম্ভব? বীরেশের হাসি পেলো—অবিশ্বাসের হাসি।

সে যে-সমাজ, যে-কৃষ্টির উত্তরাধিকারী, তার দম্ভ, তার গোঁড়ামি তার এখনো কি সাজে? ভগবান যে আজ তাকে সকল রকমে ফকির করে তার দর্প চূর্ণ করেছেন। সে আজ নিঃস্ব নিঃসম্বল—অনেকটা নিঃসঙ্গও। এখনও যদি সে জাতির অভিমান দ্বারা প্ররোচিত হয়, তবে মানুষের মহিমা প্রভৃতি বড় বড় কথা—যা আজ প্রভাতেও সে শায়লীকে শুনিয়েছে—তার সার্থকতা তার কাছেই বা কোথায়? তবে কি সে-ও ওই ধাপ্পাবাজ! তার মাঝেও ওই প্রতারকের প্রবণতা! না, না না, তা কিছুতেই হতে পারে না।—বীরেশ উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু ক্ষণপরেই কে যেন তার মনের গহন থেকে মৃদুভাষে বলতে লাগলো, 'শায়লী? সে যে তোমার ছাত্রী, তোমারই হাতে গড়া ছাত্রী।'

এইখানে এসে বীরেশের চিন্তা-স্রোত থমকে থামলো।

এমন সময় শায়লী ডাকলো, "শায়লা দাজু"!

বীরেশের সাড়া না পেয়ে সে আবার চেঁচিয়ে ডাকলো, "শায়লা দাজু! খাবার হয়েছে, নীচে এসো।"

বীরেশ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় শয্যায় উঠে বসলো এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসে থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলো।

অতি দ্রুত আহার শেষ করে বীরেশ ও শায়লী যখন উপরে উঠে এলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ভুটানী পাহাড়গুলিকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। রন্ধনের উপকরণ-ভরা থুঞ্চেটি শয্যার পাশের শাখায় বেঁধে রেখে শায়লী চা-ভরা ফ্লাস্ক দুটি বীরেশের

হাত থেকে নিলো। এবং ফ্লাস্ক দুটি ওই থুঞ্চেতে রেখে সে কেটলি হতে টিফিন কেরিয়ারের দুই বাটিতে চা ঢাললো। একটি নিজের জন্য রেখে অপর বাটিটি সে বীরেশের হাতে দিলো।

এতক্ষণ পর শায়লী হাসিমুখে বললো, "খাবার সময় তোমায় গল্প করতে দেওয়া হয়নি বলে তুমি বুঝি আমার উপর একটু চটে গেছো, না?"

বীরেশ কোন উত্তর না দিয়ে চায়ের বাটিতে চুমুক দিলো। শায়লীও এক ঢোক চা পান করে আবার বলতে লাগলো, "এবার তার কৈফিয়ত দিচ্ছি শোনো।"

বীরেশ উৎসুক নয়নে শায়লীর দিকে তাকালো।

শায়লী ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, "বোধ হয় তুমিও অনুমানে কিছুটা ধারণা করে থাকবে। যাক্‌গে, ব্যাপারটা তোমাকে খুলেই বলছি।—কয়েক বৎসর আগে এই গাছেই অসতর্কভাবে পান-আহার করার সময়ে ভুটানের এক পথিকদলের একজনকে চিতাবাঘে আক্রমণ করেছিলো। তাই এখানে রাত্রির শয্যা তরু-শাখায় বাঁধলেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনোর উপায় নেই। আমাদের সর্বদাই রণসাজে থাকতে হবে; যে কোন মুহূর্তে যে কোন শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে পারে।"

বীরেশের মুখখানা মলিন হলো। সে একটু শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করলো, "অতগুলো লোকের সামনেই?"

শায়লী স্মিত মুখে বললো, "এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এটা ওদের দেশ—ওদের রাজ্য। আমরা এখানে বিদেশী মাত্র। তবু যে আমাদের দেখে ওরা মাঝে মাঝে ভয় পায়, সেইটাই ওদের ক্ষণিকের দুর্বলতা।"

এমন সময় হঠাৎ অদূরে একটি গর্জন শোনা গেল।

"শুনলে?" শায়লী হেসে আবার এক ঢোক চা পান করলো।

"এটা কিসের ডাক?" বীরেশ আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"বাঘটাগ হবে।" শায়লী বললো।

"গত রাতের বাঘের ডাক, আর এখনকার ডাকের মধ্যে অনেকখানি তফাত মনে হচ্ছে যেন।" বীরেশ বললো।

"এটা হয়তো কোন চিতাবাঘ হবে।"—শায়লী ঘন ঘন চুমুক দিয়ে চাটুকু তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করে ফেললো এবং টিফিন কেরিয়ারের বাটিটি যথাস্থানে রেখে দিলো। তারপর ডালে বাঁধা কুড়োলটি ও বল্লমখানা খুলে এনে বিছানায় বসে সে মন দিয়ে অস্ত্রগুলির ধার পরীক্ষা কবতে লাগলো।

"কি, রণ-দামামা বেজে উঠল নাকি?" বীরেশ চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বললো।

"উঠলো বইকি! শুনলেই তো অদূরে হুঙ্কার।" শায়লী মৃদু হেসে বললো। বীরেশ অলস নেত্রে শায়লীর দিকে বারেক তাকিয়ে পকেট হতে সিগারেটের কেসটি বের করলো।

শায়লী সহসা শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর কোমরে বাঁধা খুঁকরিটি আরো শক্ত করে বেঁধে বৃক্ষের নিম্নদেশে সে নামবার উপক্রম করলো। হাতে ওর বড় টর্চটা সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে চক্ চক্ করছিলো।

"কোথায় যাচ্ছ?" বীরেশ একটু বিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

"ভয় নেই। যে দুর্গে আমরা আজ রাত্রের শিবির পেতেছি, মাঝে মাঝে তার চারিদিক ঘুরে দেখা দরকার; কারণ কোথা হতে যে কখন কোন্ জানোয়ার হানা দেবে, তার কিছু ঠিক নেই।" শায়লী মুচকি হেসে নীচে নামতে লাগলো।

বীরেশ একটি সিগারেট ধরিয়েই জোরে জোরে কয়েকটি টান দিলো। এবং বিমর্ষ মনে তার ধোঁয়ার জালের দিকে তাকিয়ে শুব্ধভাবে বসে রইলো।

সির সির করে এক ঝলক হিমেল হাওয়া হঠাৎ বটগাছের পাতায় পাতায় দোলা দিয়ে গেল। বীরেশ আনমনে কম্বলের একটি প্রান্ত তার গায়ে তুলে দিয়ে স্বপ্নাতুর নয়নে তুষারাবৃত ভুটানী গিরিশৃঙ্গগুলির দিকে চেয়ে রইলো। সে সহসা এমন এক পৃথিবীকে দেখতে পেলো, যা তার কল্পনার প্রবাহকে জোয়ারের স্রোতের ন্যায় পশ্চাতে ঠেলে নিয়ে চললো দূর হতে দূরান্তরের, যুগ হতে যুগান্তরের অতি প্রাচীন ধরিত্রীর দিকে। তার মনে হতে লাগলো, হঠাৎ কালের স্রোত উলটো বয়ে হাজার হাজার বৎসরের পুরানো পৃথিবীকে যেন ফিরিয়ে এনেছে। তারা যেন হিংস্র জীব জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রামরত মানব-অভিব্যক্তির আদিকালের নর ও নারী—যারা নিশির শয্যা পাতার জন্য এমনি গাছে গাছে ঘুরে মরছে।

শায়লী প্রায় দশ পনেরো মিনিট গাছের ডালে ডালে ঘুরে টর্চের আলোর সাহায্যে চতুর্দিক ভালভাবে নিরীক্ষণ করে এবং শেষে বৃক্ষের তলদেশ দেখে উপরে উঠে এলো।

উপরে উঠে অর্ধপীত চায়ের পাত্রটির দিকে নজর পড়ায় শায়লী বললো, "কি, তোমার চা পান এখনো শেষ হয়নি?"

বীরেশের কল্পনার আবেশ টুটে গেলো। সে অপ্রতিভভাবে শায়লীর দিকে চেয়ে শুধু বললো, "ও!"

তারপর বাকী চাটুকু এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে শূন্য পাত্রটি শায়লীর হাতে ফিরিয়ে দিলো। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বীরেশ বললো, "কিগো! শত্রুপক্ষের কোন টহলদারী সৈনিকের সঙ্গে দেখা হলো কি?"

"হলে কি এত তাড়াতাড়ি অক্ষত শরীরে ফিরে আসা সম্ভব হতো?" শায়লী মৃদু হেসে বীরেশের পাশে এসে বসলো।

"তা বটে।" বীরেশ গম্ভীরভাবে একটি সিগারেট ধরালো।

শায়লী কেবল মাঝে মাঝে টর্চের আলো তাদের আশ্রয় বৃক্ষের চারিধারে ফেলে অদৃশ্য শত্রুর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। আর বীরেশ নীরবে বসে ধূমপান করতে করতে তাদের নিশার শয্যা ধূমায়িত করে তুললো। ক্রমে নীরবতা যেন তাদের মাঝে দানা বেঁধে উঠলো। কতক্ষণ যে তাদের এইভাবে কেটে গেল, তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ অতি নিকটে একটা বুক-ফাটা আর্তনাদে শায়লী ও বীরেশ— উভয়েই চমকে উঠলো। শায়লী দৃঢ় হস্তে বর্শাখানা ধরে শয্যার উপর দাঁড়ালো এবং আর্তনাদ যেদিক হতে উঠছে, সেই দিক লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললো।

"ওকি!" বীরেশ ত্রস্তভাবে বললো।

"যাক, বাঁচা গেল।" ক্ষণকাল পরে শায়লী হাঁপ ছেড়ে বললো।

"কেন, কি দেখলে?" বীরেশ ব্যাকুল কণ্ঠে বললো।

"কোন ভয় নেই, শায়লা দাজু! প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ী সাপ একটা হরিণের প্রায় আধখানা গিলে ফেলেছে। দেখবে যদি, আমার পাশে এসো।" শায়লী বললো।

বীরেশ তাড়াতাড়ি শায়লীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো এবং বিমূঢ়ের মত দেখতে লাগলো—অদূরে নির্ঝরিণীর পরপারে একটি চিত্রিত হরিণকে এক বৃহদাকায় পাহাড়ী অজগরে অর্ধেক গ্রাস করে ফেলেছে। ওই হতভাগ্যের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে ধরণীর ধূলি সিক্ত করছে। আর তার সেই আর্ত চীৎকারে সমস্ত বনভূমি হচ্ছে প্রতিধ্বনিত। এই নিদারুণ আর্তনাদ শুনে অন্যান্য হরিণের দল দূর হতে দূরে ছুটে পালাচ্ছে। বীরেশের মনে হতে লাগলো, এই নিষ্পেষিত আত্মার করুণ ক্রন্দনে পাহাড়ের পাষাণ বুঝি বা গলে যায়! এ দৃশ্য বীরেশের কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। সে ধীরে ধীরে বিছানায় বসে পড়লো।

"কি সর্বনাশ! একটা জ্যান্ত হরিণকে গিলে খাচ্ছে!" বীরেশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো।

শায়লী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। পরে আস্তে আস্তে বল্লমখানা শয্যার পাশে রেখে সেও বসে পড়লো। আবার এক টুকরো নীরবতা তাদের মাঝে হয়ে উঠলো নিবিড়।

সেই নীরবতা ভঙ্গ করে শায়লী মন্থর কণ্ঠে বললো, "এই দৃশ্য দেখে তুমি একটু অভিভূত হয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে, শায়লা দাজু! কিন্তু আমাদের দেশের জংলী নাটকের এই তো সবে শুরু। এর দৃশ্যে দৃশ্যে অঙ্কে অঙ্কে ভয় ও বিস্ময় ভরা।

এর থেকে অধিকতর বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হতে পারে। আমরা গভীর অরণ্যে এসে পড়েছি। সামনে আমাদের অতি কঠিন কঠোর পাহাড়ী পথ। এমন বিচলিত হলে আমাদের চলবে না। আমাদের পিছনে ফাঁসিকাষ্ঠের রজ্জু ঝুলছে, সামনে মৃত্যুসম হিংস্র বন্য জানোয়ারের আক্রমণ। তাই আমাদের সাহসে ভর করে এগিয়ে চলতেই হবে। এছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।"

বীরেশ শুধু নিরুপায়ের মত শায়লীর শঙ্কাহীন মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ঝরনার অপর পারে অসহায় হরিণের ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষীণতর হতে হতে চিরনীরব হয়ে গেল। আবার একটা শীতল হাওয়ার স্রোত হুহু করে এসে অরণ্যানীর ডালে ডালে কাঁপন তুললো। বীরেশ ভুটিয়া কম্বলখানি সর্বাঙ্গে তুলে দিয়ে আবার একটি সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করলো। তার মনে হতে লাগলো, এই হিমশীতল হাওয়া যেন ওই গতায়ু হরিণের কাতর দীর্ঘশ্বাস—এই নিষ্করুণ পৃথিবীকে অভিসম্পাত করতে করতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

"শায়লা দাজু! এখন রাত্রি কত?" শায়লী জিজ্ঞাসা করলো।

সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে বীরেশ অস্ফুট স্বরে বললো, "আটটা"

ভুটিয়া কম্বলে সারা দেহ আবৃত করে শায়লী বললো, "তবে আর এখন দুজনে বসে বসে এমনভাবে গল্প করা চলবে না। কাল প্রভাতে আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আজ আমাদের পালা করে রাত জাগতে হবে। এ জায়গা বড়ই বিপদে ভরা। কখন যে কি ঘটবে, বলা মুশকিল। অসতর্কভাবে এখানে ঘুমানো কিছুতেই চলবে না। এখন কথা হচ্ছে—তুমি আগে ঘুমুবে, না আমি আগে?"

"তোমার যা ইচ্ছে।" বীরেশ বললো।

"ইচ্ছার কথা নয়, এটা সামর্থ্যের কথা। আমার মনে হচ্ছে, তুমি খুব পথশ্রান্ত। প্রথমে তোমাকে জাগতে দিলে তুমি পারবে না, কোন ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়ে একটা অঘটন ঘটাবে।" শায়লী বললো।

"তা যা বলেছ, শায়লী! আমি আজ বড়ই ক্লান্ত। ঘুমে আমার চোখ এখনি বুজে আসছে।" বীরেশ সিগারেটে একটা কড়া টান দিয়ে নিঃশেষিতপ্রায় টুকরোটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

ধীরে ধীরে বীরেশ আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। শায়লী নিদ্রিত বীরেশের শিয়রে বসে সতর্ক শাস্ত্রীর মত প্রহরের পর প্রহর গুণতে লাগলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিড় নিঝুমতায় কেটে যায়। এমন নিঝুমতা যেন স্পর্শ করা যায় হাত দিয়ে। শায়লী থেকে থেকে টর্চের আলোর সাহায্যে বটগাছের চারদিক সতর্কভাবে দেখছিলো। ক্রমে তার নয়ন স্বপ্নের আবেশে মন্থর হয়ে উঠলো, মানস-পটে ভেসে উঠলো একটি ছবি—ভুটানী পাহাড়-ঘেরা একটি ক্ষুদ্র পল্লী, যার পা ছুঁয়ে কলকল্লোলে বয়ে যাবে একটি গিরিনদী। এমনি গাঁয়ে ও বাঁধবে একখানি ঘর—একখানি কুঞ্জকুটীর। পাতবে একটি ছোট সংসার—সোনার সংসার, যা ওর জীবনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া। মাসের পর মাস যাবে কেটে। কেটে যাবে কত না অজানা সন্ধ্যা। আসবে মধুমাস। মালঞ্চে মালঞ্চে ভেসে বেড়াবে চঞ্চল সুরভি। ভুটানের অরণ্যানীতে জাগাবে সৃষ্টির শিহরণ ·•••ফুলের জোয়ার······ফলের বান। সেই প্রাণচঞ্চল কুসুমিত বনানীর সুবাসিত হিল্লোল ওদের সংসার-কুঞ্জে কি কখনো দোলা দেবে না! ওদের পুষ্প-উদার বসন্ত-পল্লীর কোন এক নিভৃত নির্ঝরিণী-তীরে দাঁড়িয়ে কোন এক জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায় বীরেশ কি মদ-মুকুলিত নয়নে ওর দিকে ফিরে চাইবে না! হায়, ফুটবে না কি সে-কুঞ্জে একটি ফুল—ফলবে নাকি একটি ফল!

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শায়লী ঈষৎ ঘুরে বসলো। সহসা ওর দৃষ্টি ঘুমন্ত বীরেশের উপর পড়লো। কম্বল মুড়ি দিয়ে বীরেশ তখন অকাতরে ঘুমচ্ছে। শায়লী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বীরেশের দিকে চেয়ে রইল।

এই বীরেশ কেমন যেন অদ্ভুত মানুষ! আজ দশ বৎসর এই চা বাগানে আছে। ক্লাব, লাইব্রেরী, গান-বাজনা থেকে আরম্ভ করে নাটকাভিনয় পর্যন্ত—বাগানের সব কিছু আমোদ উৎসবেই সে আছে, অথচ এই বাগানের কোন কিছুই যেন ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। ওর প্রশান্ত মুখখানায় এমন একটা উদাস আবেশ আছে, যা শায়লীকে আবিষ্ট করে; আর তার পুষ্পিত কথায় কেমন যেন মাদকতা, যা শায়লীর চিত্ত-ভ্রমরকে তৃষিত করে তোলে। শায়লীর মনে হয়, বীরেশ এমন মানুষ যে শুধু আকর্ষণ করে কিন্তু কেন যেন আকৃষ্ট হয় না। বন্ধনের মাঝে কেমন যেন বন্ধনমুক্তির একটা ভাব তার চাল-চলনকে বিশিষ্ট ভঙ্গীযুক্ত করে তুলেছে। তবে কি সে সন্ন্যাসী?—না, অনেকটা ছন্নছাড়ারই মত।

নারীর প্রতি নরের স্বাভাবিক দুর্বলতা শায়লী নিজের স্বল্পপরিসর জীবন দিয়েও কিছু কিছু দেখেছে, এবং নিজের রূপ সম্বন্ধে তার অন্তরের অন্তস্তলে বেশ একটু গর্বও ছিল। কিন্তু আজ বীরেশের কাছে এসে তার সে গর্ব চূর্ণ হতে বসেছে। তার হৃদয়-মন্দিরে আজ এমন একজন অধিষ্ঠিত, যে পূজা বোঝে, ভক্তি বোঝে, কিন্তু ভালবাসা যে কি বস্তু তা যেন জানে না। এ যেন সেই

ধ্যানমগ্ন ছন্নছাড়া শঙ্কর, যাঁকে শুধু রূপ-লাবণ্য দিয়ে ধরা যায় না। একথা আজ শায়লী বুঝতে পেরে অতি দুঃখে কেঁদে ফেললো। ওর দু-চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরতে লাগলো। দু-হাতে শায়লী চোখ ঢাকলো।

এমন সময়ে ধুপ্—ধাপ্—ধুপ্! শায়লীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। সে শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলে দেখলো—নির্ঝরিণীর অপর পারে একদল ভালুক একটি বনজাত কমলালেবুর গাছের তলায় ভিড় জমিয়েছে। দলপতিটি বৃক্ষের উপরে কিছুদূর উঠে সামনের পা দুটি একটি শাখার উপর রেখে গাছটি ঝাঁকাচ্ছে; আর নীচে লেবুগুলি ধুপ্ ধাপ্ করে পড়ছে। তলার ভালুকগুলি দুই গাল পুরে সেই লেবুগুলি খাচ্ছে। ভালুকের দলটি দেখে শায়লী একটু বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ একমাত্র ভালুক ও চিতাবাঘই অরণ্যে বৃক্ষ শাখায় পাতা নিশার শয্যাকেও বিপদসঙ্কুল করে তুলতে পারে। শায়লী হাতের বর্শাখানি দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করলো এবং টর্চের সাহায্যে বৃক্ষের চারদিক বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে লাগলো। তার ভয়—যদি এতগুলো ভালুক একসাথে তাদের আশ্রয়-বৃক্ষ আক্রমণ করে, তবে তাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। তাদের একমাত্র ভরসা ঐ নির্ঝরিণীটি, যা অতিক্রম করা ওদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। শায়লী বার বার টর্চের আলো ফেলে কমলালেবু গাছের তলদেশে ভালুক দলের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো।

হঠাৎ এক পাল বন্যমহিষ ওই কমলালেবুর গাছের তলদেশ দিয়ে এই গিরিনদীতে জলপান করতে এলো। তাদের সর্দারের রণং-দেহি মূর্তি দেখে ভালুক-দলপতি তার দল নিয়ে ছুটে পালালো। কি বিরাটকায় মোষ। যেন এক-একটি হাতীবিশেষ। সর্দারের কালো মিশমিশে নধর মাংসল দেহের ততোধিক কালো গাত্রলোম দিয়ে যেন তেল চুইয়ে পড়ছে। প্রকাণ্ড শিং দুটি বেঁকে সামনের দিকে দুটি শানিত বর্শার মত বের হয়ে আছে। একমাত্র হাতী ছাড়া যে কোন জানোয়ার তার আক্রমণের মুখে পড়বে, মুহূর্তের মধ্যে সেই হতভাগ্য টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পালের অন্যান্য প্রধানরাও অবজ্ঞার পাত্র নয়; তবু বিশেষ করে পালের গোদাটির দিকে শায়লী বিস্ময়াবিষ্ট চোখে চেয়ে রইলো।

জলপান করে একে একে মোষের পাল অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় ঘটলো এক অঘটন। সকলের শেষে জলপান করে উঠবার সময় একটি কিশোর মোষকে চিতাবাঘে আক্রমণ করলো। মোষটি গাঁ গাঁ স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো। তৎক্ষণাৎ মোষের দল ঘুরে দাঁড়ালো এবং চক্ষের নিমেষে গোদাটি লেজতুলে শিং বাঁকিয়ে ছুটে এলো। পলক মধ্যে জানোয়ারটি এমন ভীষণ

বেগে আক্রমণ করলো যে, বাঘটি একটি শব্দ করবারও অবসর পেল না। শায়লী টর্চের আলোয় দেখলো, চিতাবাঘটি ক্রুশবিদ্ধের মত সর্দারটির শিং দুইটিতে গেঁথে রয়েছে। একটি শিং হতভাগ্যের বুক ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছে। পরক্ষণে মোষটি এমনভাবে শিং ঝাড়া দিল যে বাঘটি ছিটকে নির্ঝরিণীর বুকে গিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ঝপাৎ করে একটি শব্দ হলো। মৃত পশুটি বিদ্যুৎ গতিতে নির্ঝরিণীর স্রোতে কোথায় ভেসে গেল, কে জানে! মোষদের দলপতি তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটির ক্ষত স্থানের রক্ত চেটে মুছে ফেললো। তর"র মোষের দল ধীরে ধীরে আহত সাথীটিকে নিয়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।...শায়লী স্তব্ধভাবে বসে ভাবতে লাগলো—হায়রে! বনের পশুর কাছেও মানুষের অনেক কিছু শেখবার আছে।

আবার নিঝুমতা নেমে এলো আশ্রয়-বৃক্ষের শাখায় শাখায়। শায়লী আবার ডুবে গেল চিন্তার সাগরে, যে-সাগরে ওর ভাবীকালের সোনার সংসার ভয় ও বিস্ময় হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গে সর্বদাই দোদুল্যমান। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো, কিন্তু শায়লীর সেদিকে খেয়াল নেই।

খস্ খস্ খস্—খস্ খস্ খস্! এত নিকটে? শায়লী সন্ত্রস্তভাবে ফিরে তাকালো —সর্বনাশ! এ যে একটি চিতাবাঘ! জানোয়ারটা ওর অন্যমনস্কতার সুযোগে একেবারে ওদের শয্যা ধরে ফেলবার উপক্রম করেছে। শায়লী নিমেষ মধ্যে হাতের বর্শা দিয়ে বাঘটিকে মারাত্মক আঘাত হানলো। পশুটি মুখ বিস্তার করে বর্শাটি কামড়ে ধরতে যেতেই বর্শার ফলা প্রচণ্ড গতিবেগে জানোয়ারটির চোয়ালখানা ভীষণভাবে আহত করে মুখের মধ্যে গিয়ে বিধলো। তবুও জানোয়ারটি ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে উপরে উঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময় বীরেশের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলো এবং ভীতকণ্ঠে ডাকলো, "শায়লী।"

"সর্বনাশ হয়েছে, শায়লা দাজু! শীগ্‌গীর তুমি এই বর্শাটা শক্ত করে ধর। কিছুতেই জানোয়ারটাকে ঠেলে উপরে উঠতে দেবে না। ওটা যদি আমাদের বিছানার জাল ধরতে পারে, তবে আমাদের মৃত্যু অবধারিত।" শঙ্কিত কণ্ঠে শায়লী বললো।

"ওরে বাপরে!" ভীষণ আকৃতির চিতাবাঘটি দেখে বীরেশ বিমূঢ়ের ন্যায় শয্যার উপরে দাঁড়িয়ে রইলো।

শায়লী রাগে চীৎকার করে উঠলো, "হাঁ করে হাবার মত দেখছো কি? শীগ্‌গীর এই বল্লমটা ধর, নয়তো ওই কুড়োলটা দিয়ে ওটাকে আঘাত কর।"

বীরেশ কম্পিত হস্তে বর্শাটি ধরলো। শায়লী ক্ষিপ্রহস্তে কুড়ালখানি নিয়ে প্রচণ্ড

শক্তিতে পশুটার মাথায় উন্মাদের মত বার বার আঘাত করতে লাগলো। ক্ষণপরেই জন্তুটা ভীষণ আর্তনাদ করতে করতে শাখাচ্যুত হলো এবং ডাল হতে ডালে পড়তে পড়তে অবশেষে ভূতলে পড়ে হৃদয়বিদারী গর্জন করতে লাগলো। উত্তেজনার ক্লান্তিতে বীরেশ বিছানায় বসে পড়লো। শায়লী ক্ষণকাল কুঠার হস্তে তেমনি উগ্র-চণ্ডা মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইলো। বীরেশ নিষ্পলক চোখে দেখতে লাগলো শায়লীকে নবরূপে।

"মস্তবড় একটা ফাড়া কাটলো।" গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শায়লী বললো।

তারপর থুঞ্চে থেকে একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বের করে রক্ত-সিক্ত কুড়ালখানা মুছতে লাগলো। কুড়ালখানি মুছে বীরেশের হাত হতে বর্শাটি নিয়ে সেটিও মুছে সে শয্যার পাশে রেখে দিলো।

নীচে চলতে লাগলো আহত চিতাবাঘটির অবিরাম আর্তনাদ, আর বনানীর মাঝে জাগলো চাঞ্চল্য। বাঘ ও বাঘ থেকে ছোটখাটো সব জীবজন্তুগুলি দূর হতে দূরে ছুটে পালাতে লাগলো। শায়লী টর্চের আলোয় দেখলো—একটি চিতাবাঘ বৃক্ষতলে এসে এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে উর্ধশ্বাসে ছুটে পালালো।

শায়লী আবার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "শায়লা দাজু! চা খাবে?"

"আঃ! বাঁচালে শায়লী!" বীরেশ উৎফুল্ল হয়ে বললো। শায়লী চায়ের ফ্লাস্কটি বের করে টিফিন কেরিয়ারের একটি বাটি নিয়ে বীরেশের সামনে বসে পড়লো। খানিকটা চা বাটিতে ঢেলে রেখে ফ্লাস্ক ধরে বীরেশের হাতে দিয়ে শায়লী স্মিত মুখে বললো, "নাও, গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও।"

বীরেশ দ্বিরুক্তি না করে ঢক্ ঢক্ করে কিছুটা চা এক নিঃশ্বাসে পান করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। বীরেশের চা পানের ভঙ্গী দেখে মৃদু হেসে শায়লী বললো, "মা গো, যেন তৃষিত চাতক।" বীরেশ শুধু ঈষৎ হেসে অদূরে জ্যোৎস্নাস্নাত তুষারাবৃত গিরি-শৃঙ্গগুলির দিকে চেয়ে রইলো। শায়লীও আর বাক্য ব্যয় না করে চা পান করতে লাগলো। আর বীরেশের শিল্পী মন ধীরে ধীরে পাড়ি জমাতে লাগলো দিগন্তবিসারী দূর শুভ্রলোকের দিকে।

শায়লী চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, "শায়লা দাজু! তোমার চা হিম হয়ে যায় যে?"

"ওঃ—হোঃ! তাইতো!" বীরেশ একটু থতমত খেয়ে আবার ফ্লাস্কটিতে চুমুক দিলো।

কিছুক্ষণ তন্ময়ভাবে দূরলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে বীরেশ বললো, "শায়লী!

দেখো ওই বরফঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলি। কি সুন্দর দেখাচ্ছে! তার উপরে পড়েছে চাঁদের আলো। মনে হয়, শ্বেত-মর্মরে তৈরী যেন এক স্বপ্নের দেশ!"

"বাবা গো! এ যে একেবারে খাঁটি কাব্য। তা তুমি এখন কবিত্ব করতে পার, কারণ ব্যাঘ্র মহাশয়ের এ দুর্গতির পর আমাদের আর কেউ ঘাঁটাতে সাহস করবে না।—হ্যাঁ, তারপর আর কি মনে হয়?" শায়লী মৃদু হেসে বললো।

বীরেশ তেমনি স্বপ্নাতুর চোখে শায়লীর দিকে চেয়ে বললো, "আর মনে হয়, তুমি ও আমি দুঃখের পথ বেয়ে চলেছি ওই দেশে।—এ যেন আমাদের স্বপ্ন-অভিসার!"

এবার শায়লী খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, "আচ্ছা, শায়লা দাজু! ইস্কুলের মাষ্টার মশায়রা অভিসার বোঝেন?'

"তোমরা যেমন করে বুঝে থাক, হয়ত তেমন করে বোঝেন না। হয়তো তোমার কথাই ঠিক—তাঁরা কর্তব্যের নিগড়ে বাঁধা প্রাণহীন মানুষ। কিন্তু তাঁদের জীবনেও বসন্ত আসে। ফাল্গুনের ফুলবনে দাঁড়ালে তাঁদের প্রাণও হয়তো চঞ্চল হয়। তবু তাঁরা কর্তব্যের কঠিন কশাঘাতে সে-চঞ্চলতা দমন করে থাকেন। এবং সমাজের কল্যাণে এ সংযমেরও প্রয়োজন আছে। আর তা যদি না-ই মানো, এটা তোমার মানতেই হবে যে চরিত্রের এ দৃঢ়তা—আর যাই হোক—নিশ্চয়ই অবজ্ঞার বস্তু নয়। শায়লী, তুমিও একথা একদিন বুঝবে, কিন্তু সে-দিন আসতে এখনো কিছু দেরি আছে।" বীরেশ প্রশান্ত কণ্ঠে বললো।

বীরেশের কণ্ঠ হতে একটা পুঞ্জীভূত বেদনার ধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো, যা শায়লীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে থেমে গেল। শায়লী লজ্জাবনত মস্তকে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে টিফিন কেরিয়ারের বাটিটা থুঞ্চেতে তুলে রেখে ক্লান্ত দেহে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। বীরেশ নীরবে পকেট থেকে সিগারেটের 'কেস'টি বের করে শেষ সিগারেটটিতে আগুন ধরালো।

"শায়লা দাজু, এবার তোমার পালা। তুমি এখন একটু চৌকিদারি কর, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমনোর চেষ্টা করি। কারণ কাল তো আবার অনেকটা পথ হাঁটতে হবে কিনা।" শায়লী বললো।

"শেষ পর্যন্ত তুমি এ অধমকে কি চৌকিদারের কাজের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করলে, শায়লী?" বীরেশ হেসে তার ক্ষণপূর্বের গম্ভীরভাব একটু হালকা করে নেবার চেষ্টা করলো।

"বা রে! এতে দুঃখিত হবার কি আছে? একেবারে 'পাবলিক সারভ্যাণ্ট' যাকে বলে কিনা লোকসেবক—একেবারে একান্ত অনুগত ভৃত্য।" শায়লী হাসতে হাসতে কম্বলখানি দেহের উপর তুলে দিলো।

আবার নীরবতা তাদের আশ্রয়-তরুর শাখায় শাখায় নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠলো। শীতের গভীর রাত্রি। দেখতে দেখতে বীরেশের চারিদিকের অরণ্যতল নিষ্প্রাণ ও নিস্পন্দ হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে কোথাও প্রাণের সাড়ামাত্র নেই। সহসা কোন এক মহাশক্তিশালী যাদুকর যেন তার সম্মোহিনী শক্তি-বলে সমস্ত বনপ্রদেশ নিষ্প্রাণ বস্তুতে পরিণত করেছে। রজনীর এমন প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বীরেশ আগে কখনো জীবনে অনুভব করেনি। তার মনে হতে লাগলো—আহা! ওই হতভাগ্য চিতাবাঘটি যদি এখনো আর্তনাদ করতে পারতো, তবে তাও যেন এই অস্বস্তিকর নীরবতা হতে অনেক শ্রেয় হতো। কিন্তু হায়! জানোয়ারটির কণ্ঠ বহুক্ষণ হলো নীরব হয়ে গেছে। আর সে কণ্ঠ পৃথিবীর বায়ু-লোকে কোনদিন স্পন্দন তুলবে না। বীরেশের মন হঠাৎ অকারণ করুণায় ভরে উঠলো। সে টর্চের আলোর সাহায্যে ব্যাকুলভাবে চিতাবাঘটির মৃতদেহ সতর্ক দৃষ্টিতে বৃক্ষতলে খুঁজতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে দেখলো—অদূরে একটি ঝোপের ধারে বাঘটি লম্বমানভাবে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে। তার আহত মস্তক ও শরীর হতে রক্ত ঝরে শীর্ণ বনপথের ধূলি ভিজে উঠেছে। বীরেশ একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টর্চটি শয্যায় রেখে দিলো।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো শায়লীর ঘুমন্ত মুখের উপর। ওর পুষ্পপেলব মুখখানি আধো-আলোয়, আধো-আঁধারে যেন স্বপ্নসুষমায় ফুটে উঠেছে। বর্ষণ-মুখর আকাশের দিকে চেয়ে তৃষিত পথিক যেমন সংশয়াকুল চিত্তে ভাবে—একি সেই আকাশ, যার বুক থেকে বজ্রের আগুন ঝরে পড়ে! তেমনি বীরেশও নির্নিমেষ চোখে শায়লীর মুখখানির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো—একি সেই শায়লী, যে ক্ষণকাল পূর্বে মহিষ-মর্দিনীরূপে ক্ষুধার্ত বন-শার্দুলকে কুঠারাঘাতে সংহার করেছে কিন্তু এখন কোথায় ওর সেই চণ্ডিকা-মূর্তি, কোথায়ই বা ওর চোখে মুখে সেই জিঘাংসু বজ্র-কাঠিন্য, যা দেখে বনের পশুও ভয়ে পথ ছেড়ে দেয়? এখন ওর সারা দেহ ভরে রয়েছে এমনি এক স্নিগ্ধ কোমল কমনীয়তা, যা পল্লীমেয়ের দেহতটকে করে তোলে উচ্ছল।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও শায়লীর ভালবাসায় বীরেশ সন্দেহের অবকাশ পায় না। অথচ, রূপ?—চেহারা তার এমন কিছুই নয়। গুণ?—তেমন করে বলার মত কি-ইবা আছে? অর্থ?—তা শুধু যৎসামান্যই নয়, যারপরনাই হাস্যোদ্দীপক। আর মান?—চা বাগানের কম্পাউণ্ডারবাবুর মান শূন্যের কোঠায়। আর, তার তুলনায় ছোট সাহেব—এ যেন চিন্তাও করা যায় না। ছোট সাহেব অর্থাৎ ভাবীকালের ম্যানেজার। বাগানে প্রতাপ প্রতিপত্তিতে বর্তমান ম্যানেজারের

নীচেই তার স্থান। বেতন, বোনাস, ভাতা, উপরি ইত্যাদি মিলে ম্যানেজার সাহেবরা যা পেয়ে থাকেন, তা আমাদের দেশের অনেক জমিদারকে প্রলুব্ধ করবে। এইসব সাহেবদের অঙ্কশায়িনী না হয়ে শায়লী শেষে কিনা তাকেই বেছে নিল! অন্ধ ভালবাসা ভিন্ন এ নির্বাচন কি সম্ভব?—বীরেশ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে।

শায়লীকে কেন্দ্র করে তার দুর্গতির সূচনা; তাই কি শায়লী নিছক কর্তব্যবোধে তার অনুগামিনী হয়েছে?—এ ভাবে চিন্তা করেও বীরেশ বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। কারণ তার ধারণা, শুধু কর্তব্যের তাগিদে নিঃসম্পর্ক একটি পাহাড়ী তরুণী মৃত্যুপথযাত্রী একটি বাঙালী তরুণের সঙ্গে তার ভাগ্যকে এমনভাবে গেঁথে দিতে পারে না। এই প্রাণান্তকর দুর্বহ ভার বইবার শক্তি কর্তব্যবোধের খুব কমই থাকে; এ শক্তি আছে একমাত্র সেই সর্বজয়ী ভালবাসার। আর শায়লী তো স্পষ্টই বলেছে—প্রাণের স্পর্শবিবর্জিত কর্তব্যের প্রতি ওর কোন শ্রদ্ধা নেই। এর পর বীরেশের ভাববার আর কি আছে? শায়লী তাকে ভালবাসে এবং ভালবাসে বলেই সে আজ তার দুর্গম পথের সঙ্গিনী—অনেকটা জীবনমরণ-সঙ্গিনীও বটে।

সেই শায়লীকে কেবল ছাত্রী বলেই কি প্রত্যাখ্যান করতে হবে? বীরেশের নানা কথা মনে পড়তে থাকে। গতকাল শায়লী বলেছিল, "শায়লা দাজু, কেন তুমি আমায় অমন বুকভরা ভালবাসা দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে? কেন আমায় গ্রহণ করতে দিয়েছিলে উন্নত জীবনের স্বাদ?…" '—বুকভরা ভালবাসা দিয়ে—' শায়লীর এ কথাগুলো কি মিথ্যা? বীরেশ ভাবতে থাকে—হয়তো তার মনের মগ্ন চেতনার ছায়ালোকে ওইরূপ কোন এক সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকতেও পারে; নতুবা এত পাহাড়ী মেয়ে থাকতে সে কেনই বা শায়লীর জন্য এমন পরিশ্রম করতে গিয়েছিল? বীরেশের ইস্কুলে বাঙালী, পাহাড়ী অনেক ছাত্র-ছাত্রীই তো ছিল, কিন্তু বীরেশ ব্যক্তিগতভাবে শায়লীর জন্য যা করেছে, তা সে আর কারো জন্য করেনি। শায়লী অসাধারণ, শায়লী তীক্ষ্ণধী—এই কি তার একমাত্র যুক্তি? বীরেশের এখন মনে হয়—কথাটি বোধহয় ষোল আনা সত্য নয়। শায়লীর মনীষার সঙ্গে ওর দেহ-শ্রীও কি বীরেশের অবচেতন মনে তাদের মিলনের এক অদৃশ্য পটভূমিকা সৃষ্টি করেনি, যার ফলে বীরেশ শায়লীর লেখাপড়া সম্বন্ধে চিরদিনই একটা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে? এই দৃষ্টিই যে পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে একটা ভাল-লাগা ভাবের সৃষ্টি করেনি, একথা কি বীরেশ আজ জোর করে বলতে পারে? কিন্তু সেই ভাল-লাগা ভাবই যে পরিশেষে একদিন ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে—এ চিন্তা বীরেশ ইতিপূর্বে আর কোনদিন করেনি।

তার মনে পড়তে লাগলো শায়লীর বাবা রামচন্দ্রের কথা। পাহাড়ীর বুকে

বাঙালী পিতার অপত্যস্নেহ দেখে বীরেশ সেদিন শুধু মুগ্ধই হয়নি, কতকটা অভিভূতই হয়ে পড়েছিলো। রামচন্দ্র অশ্রুসজল চোখে সেদিন বীরেশের হাতে শায়লীকে সঁপে দিয়ে বলেছিলো "শায়লা বাবু, আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় যে, তাকে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি ওকে গ্রহণ করো।"

সেদিন বীরেশ প্রতিবাদ করেনি, বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কতকটা যেন সম্মতিই জানিয়েছিলো। সেদিনের মৌনভাব যে আশ্বাস বৃদ্ধ নেপালীকে দিয়েছিলো, হৃদয় বলে যদি কোন কিছু বীরেশের থাকে তবে কি সে বৃদ্ধ নেপালীর সে-বিশ্বাসকে পদদলিত করতে পারে? নিজের অজ্ঞাতসারে যাকে সে একরূপ গ্রহণই করে ফেলেছে, আজ তাকে সে কি করে প্রত্যাখ্যান করবে? ঘটনার এই দ্রুত, বিচিত্র ও আকস্মিক পরিণতি নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান বলে তার মনে হয়। একে ভাঙতে চাইলেই কি ভাঙা যায়? যে বিধান অলক্ষ্য লোক হতে ঈশ্বরের আশীর্বাদরূপে নেমে এসেছে, তাকে ভাঙতে গিয়ে কেন সে অকল্যাণকে ডেকে আনবে? যে শায়লীকে সে নিজের স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে, তাকে কেন সে তার চোখের সম্মুখে ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে, এবং তাতে তারই-বা কোন ইষ্ট সিদ্ধ হবে?—শায়লীর অপরাধ—ও এমন একটি যুবককে ভালবেসেছে, যে ওর শিক্ষক, যে ওর পশুজীবনের অবসান ঘটিয়েছে। আজ সেই যুবকের মৃত্যুপথেই শায়লী কেবল সহচরী নয়, প্রয়োজন হলে তার হাত ধরে সহমরণ পর্যন্ত বরণ করতেও প্রস্তুত। সমাজের ভয়ে প্রেমের এরূপ জীবন্ত বিগ্রহকে আজ পরিত্যাগ করা, বীরেশের মনে হয়, জীবনকে অস্বীকার করা। এ বীরেশ কিছুতেই মানতে পারে না। সমাজকে ততক্ষণই অনুসরণ করা চলে, যতক্ষণ তার বিধি জীবনকে স্বীকার করে চলে। জীবনকে অস্বীকার করে যে সমাজ, সে সমাজ আর যার জন্যই হোক, প্রাণবান মানুষের জন্য নয়। বীরেশের রক্তে রক্তে সহসা যেন সেই চিরকালের সহজিয়া বাঙালী জেগে উঠলো।

এমন সময় মড় মড়—মটাস্ শব্দ করে তাদের আশ্রয় তরুর একখানি বড় ডাল ভেঙে পড়লো। বীরেশ চমকে সেইদিকে টর্চের আলো ফেললো। সর্বনাশ! একদল বন্যহস্তী নিঃশব্দ চরণে একেবারে তাদের বটগাছের তলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এদের বিশালকায় দলপতির দাঁত দুটি ধারালো তরবারির ন্যায় বেঁকে সূক্ষ্মাগ্র বর্শার মত বের হয়ে পড়েছে।

বীরেশ ভীত কণ্ঠে ডাকলো, "শায়লী!"

গাছের ডাল ভাঙার শব্দে শায়লীর ঘুম প্রায় ভেঙে গিয়েছিলো। ডাকামাত্র সে শয্যায় উঠে বসলো। টর্চের আলোর সাহায্যে বীরেশ তাকে হাতীর দলটি দেখিয়ে দিলো।

"চুপচাপ থাক, শায়লা দাজু! ওগুলো আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।" শায়লী বীরেশকে আশ্বস্ত করে আস্তে আস্তে বললো।

গজেন্দ্রটি মন্থর পদে নদীতে নেমে জলপান করতে লাগলো। দেখতে দেখতে সমস্ত দলটি তার অনুগমন করলো। লাইন বেঁধে ছোট বড় দশ-বারটি হস্তী ও হস্তিনী নদীতে নেমে পড়লো। তাদের বংশীবিনিন্দিত কণ্ঠের আলাপন ও পাশব জলক্রীড়া মৌন নিশীথিনীকে আবার মুখর করে তুললো। জ্যোৎস্না-ধোয়া গিরি-নদীতে হাতীগুলির জলকেলি বীরেশ ও শায়লী নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগলো।

সহসা এক মহাবিভ্রাট ঘটে গেল। নদীর অপর পারে এমন সময় আর একদল হাতী জল পান করার জন্য এসে হাজির। তাদের সর্দারও মহাবলশালী ও বিরাটকায়। তার বাঁকা বৃহৎ দন্ত দুটির একটির অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ভেঙে যাওয়ায় দাঁতটি আরো তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। তার দেহের সম্মুখভাগে এবং মস্তকের আশেপাশে ইতস্ততঃ ক্ষতচিহ্ন এখনো বিদ্যমান। এই সর্দারটি পূর্বের দলপতি হতে বেশী শক্তিধর কিনা, বলা মুশকিল; কিন্তু পরেরটি উগ্র হিংস্রতার প্রচণ্ডতায় আগেরটিকে পিছনে ফেলেছে। পরে-আসা দলপতিটির যে বিশেষ সমর-অভিজ্ঞতা আছে, তা তার ভাঙা দাঁত ও দেহের ক্ষতচিহ্নগুলি দেখে বেশ বুঝতে পারা যায়। শায়লী সেই উগ্র-চণ্ড গজপতিটিকে দেখে শিউরে উঠলো।

"সর্বনাশ! এখনি বোধহয় প্রচণ্ড হানাহানিতে সমস্ত বনতল কেঁপে উঠবে।" শায়লী অস্ফুট স্বরে বললো।

বীরেশ শুধু অবাক হয়ে ওই গজেন্দ্র দুইটির দিকে চেয়ে রইলো।

"শায়লা দাজু! শীগ্‌গীরি পাশের ডালটি খুব শক্ত করে ধর। জানোয়ার দুটো এখনি যে কি প্রলয় কাণ্ড করবে, তার ঠিক নেই।" শায়লী শঙ্কিত কণ্ঠে বলতে বলতে ঠিক বীরেশের পাশে এসে বসলো এবং তাড়াতাড়ি দৃঢ় হস্তে পাশের ডালটি ধরলো। শায়লীর কথা শেষ হতে না হতেই ভগ্নদন্ত গজপতিটি ভীষণ গর্জন করে উঠলো। নির্ঝরিণীর বুক হতে অনুরূপ প্রত্যুত্তর উঠে যেন নৈশ গগন বিদীর্ণ করে ফেললো। গাছের ডাল শক্ত করে ধরে ভয় ও বিস্ময়ে কাঠের পুতুলের মত শায়লী ও বীরেশ শয্যায় বসে রইলো।

মুহূর্তের মধ্যে উভয় দলের হাতীগুলি অরণ্যপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। রইল শুধু দল-ছাড়া দুই দলপতি। এদের তর্জন-গর্জন ও ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র অরণ্যতল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। ডাল ভেঙে গাছ উপড়িয়ে গজপতিদ্বয় এক প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করলো। এদের আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণের দাপটে বৃক্ষলতাপূর্ণ বনভূমির সেই অংশটি দেখতে দেখতে তরুলতাশূন্য একটি ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে পরিণত হলো।

বিহঙ্গের ভয়ার্ত কলরবে নিশীথের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ভীত বানরের দল গাছ হতে গাছে লাফাতে লাফাতে ছুটতে লাগলো। হস্তী-ইতর জীব জন্তুগুলি প্রাণভয়ে গভীর বনানী ভেদ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। ঝড় ও ভূমিকম্প যেন একসঙ্গে নেমে এলো বনভূমিতে।

বীরেশ ও শায়লী কম্পিত বুকে কম্পমান আশ্রয়-তরুতে বসে যেন গজরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভের রক্তস্রাবী সংগ্রাম দেখতে লাগলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে আত্মঘাতী লড়াই, যেন শেষ নেই তার। উভয়ের দেহ ক্ষত-বিক্ষত রুধিরস্নাত। ভগ্নদন্ত গজপতিটির ভাঙা দাঁতটি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। শুঁড় বেয়ে রক্ত-ধারা ঝরে পড়ছে। অপর গজেন্দ্রটির দাঁতের অর্ধাংশ ভেঙে পড়েছে। শুঁড়টি ভীষণভাবে আহত ও রক্তাক্ত। দুর্বিষহ ক্ষিপ্ততার জ্বালা তাদের মৃত্যুর সীমান্তবর্তী করেছে, কিন্তু বিরাম নেই তবু। হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদে নিশীথের আকাশ যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। শায়লী ও বীরেশ চমকে চেয়ে দেখলো—যুদ্ধরত অবস্থায় উগ্রচণ্ড হাতীটি পদস্খলিত হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে শত শত ফিট নীচে গিরিগহ্বরে গিয়ে পড়ছে।

"কি প্যাথেটিক্!" বীরেশ চোখ বুজলো। পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর পতনশব্দে বনভূমি আবার কেঁপে উঠলো। বীরেশ চোখ মেলে দেখলো—যে পথে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পাতালপুরীতে প্রবেশ করেছে, সেই পথ ও গিরিগুহার দিকে মুখ করে স্তব্ধভাবে শোনিত-স্নাত দেহে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ী গজেন্দ্রটি।

আবার অরণ্যানী ক্রমশঃ নিঝুমতার সাগরে ডুবে যেতে লাগলো। বিজয়ী গজেন্দ্রটি ধীরে ধীরে রণক্লান্ত দেহে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল। বীরেশ শূন্য রণভূমির দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। সে বললো, "দেখছো শায়লী, মৃত্যু আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছে? শেষ পর্যন্ত আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবো তো?"

বীরেশের কথা শুনে কেঁপে উঠলো শায়লীর বুক। কিন্তু সে যেন কিছুই শুনতে পায়নি, এইরূপ ভান করে প্রসঙ্গটি চাপা দেবার চেষ্টা করলো। থুঞ্চে হতে শেষ চায়ের ফ্লাস্কটি বের করে সে বললো, "শায়লা দাজু, এস একটু চা খাওয়া যাক। আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।" শায়লী ভারাক্রান্ত মনে বাটিতে চা ঢালতে লাগলো। বীরেশ উদাস দৃষ্টিতে শূন্য রণভূমির দিকে চেয়ে রইলো।

তখনও থেকে থেকে মুমূর্ষু হাতীটির করুণ আর্তনাদ নিষুপ্ত নিঝুমরাত্রির আকাশ বাতাস শোকাতুর করে তুলছিলো।

নয়

রজনীর শেষে তখনো কুহেলীম্লান জ্যোৎস্না ভেদ করে প্রত্যূষের প্রথম আলো বীরেশদের রাত্রির শয্যায় নেমে আসেনি। হঠাৎ একটা পাহাড়ী পাখার বিকট চীৎকারে বীরেশের ঘুম ভাঙলো। বীরেশ ঘুম-ভাঙা চোখে চেয়ে দেখলো—ঘুমের ঘোরে কখন যেন ওরা দুজনে মুখোমুখি শুয়ে ঘুমচ্ছে। শায়লীর শুভ্র সুডোল বাম হাতখানি তার গলদেশের উপর শিথিলভাবে পড়ে আছে। তার এলো চুল এসে বীরেশের মুখপ্রান্ত স্পর্শ করেছে। ওর কেশের বাস, ওর নবনীত বাহুপাশ, ওর মৃদু তপ্ত নিঃশ্বাস এক স্বপ্ন-মধুর মাদকতায় বীরেশকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বীরেশের একবার মনে হলো, শায়লীর হাতখানা নামিয়ে রেখে সে আবার পিছন ফিরে শোয়। কিন্তু তা আর হলো না। কেমন যেন কুণ্ঠাজড়িত পুলকের বিবশ-করা আবেশ তার সারা অঙ্গ ছেয়ে রইলো। বিলীয়মান চাঁদের আলোয় বীরেশ শায়লীর মুখের পানে চাইলো—কুহেলীম্লান অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে পাহাড়ী মেয়ের সহজ পেলব মুখশ্রী এক বিস্ময়কর অনন্যতায় রহস্যময় হয়ে উঠলো তার কাছে। ওর ঈষৎ অসংবৃত দেহে যেন মঞ্জরিত বনানীর মঞ্জুশ্রী! বীরেশের মনে হয়, শায়লী যেন বন-কন্যা—অভিসারে বেরিয়েছে, যে-অভিসারে কামনার চঞ্চলতা বেদনার তপস্যায় সমাহিত হয়ে অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনা করেছে।

শায়লীকে—একদিন নয়, দুদিন নয়—আজ দশ বৎসর ধরে কতভাবে কতরূপে সে দেখেছে, কিন্তু এমন করে তো কোনদিনও দেখেনি। তাই বীরেশের আজ মনে হয়—রূপ শুধু থাকলেই হয় না, তাকে মধুময়ক্ষণে রহস্যময় পরিবেশে দেখতে কয়জনে পায়? …বীরেশ আবার স্বপ্নালস চোখে শায়লীর দিকে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু কুহেলিকার বুকে প্রভাতের অস্পষ্ট আভাস স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগলো।

এমন সময় শায়লী পাশ পরিবর্তনের একটা নিষ্ফল চেষ্টা করে নড়ে উঠলো। বীরেশ সলজ্জ সঙ্কোচে চোখ বুজলো। …

শায়লীর যখন ঘুম ভাঙলো, তখন বেলা হয়েছে বেশ। গহন অরণ্যের ঘন পাতার আবরণ ভেদ করে আলোর রশ্মি ভূমি স্পর্শ করেছে। এত দেরিতে ঘুম

ভাঙায় শায়লী বিশেষ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো এবং তাড়াতাড়ি রন্ধনের উপকরণপূর্ণ ঝুড়িটি নিয়ে নীচের প্রশস্ত বৃক্ষ-গহ্বরে নামলো। তারপর সে পূর্বদিনের মত কেটলিতে দড়ি বেঁধে নদীর বুক থেকে জল তুললো। নিজে হাত মুখ ধুয়ে বীরেশের জন্য দুই ফ্লাস্কে করে জল উপরে এনে রাখলো। শায়লী দেখলো, বীরেশ তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তাকে না জাগিয়ে সে দ্রুত নীচে নেমে গেল। এত বেলা হওয়াতে শায়লীর গত রাত্রে নির্ধারিত ভ্রমণ-সূচীর কিছু পরিবর্তন করতে হলো। সে নদী হতে জল তুলে দুই বাটিতে চিড়ে ভেজালো তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়ে বৃক্ষ-কোটরে বসে চায়ের জল ফুটাতে লাগলো।

চায়ের জল প্রায় ফুটে এলো। শায়লী আবার উপরে গিয়ে দেখলো, বীরেশ সদ্য ঘুম থেকে উঠে ঘুম-ভরা চোখে বিড়ি টানছে।

"শায়লা দাজু, শীগ্‌গীরি মুখ ধুয়ে ফেলো। আমার চা হয়ে এলো। ওই যে দুফ্লাস্ক-ভরা মুখ ধোবার জল রয়েছে। মুখ ধুয়ে ফ্লাস্ক দুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে এসো।" শায়লী যেমন দ্রুত এসেছিলো তেমনি দ্রুত নীচে নেমে গেল।

বীরেশ নীচে নেমে দেখলো—শায়লী কেটলিতে করে চা তৈরী করছে। সে শায়লীর হাতে ফ্লাস্ক দুটি দিলো। শায়লী একে একে ফ্লাস্ক দুটি চা দিয়ে পূর্ণ করলো। পরে দুই বাটিতে চা ঢেলে একটি সে বীরেশের হাতে তুলে দিলো এবং অপরটি নিজে নিয়ে তাতে একটি মৃদু চুমুক দিলো।

বীরেশ নীরবে চা পান করতে লাগলো। শায়লী প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, "শায়লা দাজু, আমরা আজ এত দেরিতে উঠেছি যে আমাদের কর্মতালিকার কিছু কিছু পরিবর্তন না করে উপায় নেই। আমাদের এ বেলার আহার এখনি শেষ করতে হবে ; অবশ্য আমাদের হাতে যে সামান্য কাজ আছে, সেটুকু সেরে।"

শায়লী আবার এক ঢোক চা পান করলো।

বীরেশ নির্বাক বসে শুধু শায়লীর কথা শুনছিলো।

"কটা বাজে ?" শায়লী জিজ্ঞাসা করলো।

"নটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।" হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বীরেশ বললো।

"মা গো, দেখতে দেখতে এত বেলা হয়ে গেল ?" শায়লী বারে বারে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে পাত্রটি শূন্য করে ফেললো। সে বীরেশকে শীগ্‌গীরি চা পান শেষ করার তাগিদ দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল।

বীরেশ ঘন ঘন কয়েক ঢোক চা পান করে শূন্য দৃষ্টিতে গত রাত্রির রণক্ষেত্রের দিকে চেয়ে রইলো।

শায়লী ক্রমে ক্রমে সব কিছু উপর থেকে নীচে নামালো। তারপর দুইখানি

বাঁশের খণ্ড বীরেশের সামনে রেখে সে বললো, "শায়লা দাজু, এই বাঁশের টুকরো ছুটো ফেড়ে এক ইঞ্চি চওড়া করে কতকগুলি কাঠি বানাও ; আমি ততক্ষণ মাথা ধোয়ার কাজটা সেরে ফেলি।"

শায়লী কেটলিতে দড়ি বেঁধে যে ডালখানি নদীটির বুকে ঝুঁকে পড়েছে, সেই দিকে চলে গেল।

বীরেশ চা পান শেষ করে জলে-যাওয়া বিড়িটিতে শেষ টান দিয়ে সেটি দূরে নিক্ষেপ করলো। এবং আস্তে আস্তে কোমর-বন্ধ হতে ভুজালীখানা বের করে শায়লীর নির্দেশিত কাজে মনোনিবেশ করলো।

কেশ বিন্যাস ও বেশ পরিবর্তন করে শায়লী যখন ফিরে এলো, তখন বীরেশের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শায়লী আর বাক্যব্যয় না করে টুকরি হতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বের করে ছোট ছোট মশাল প্রস্তুত করতে লাগলো।

বীরেশ কাজ শেষ করে কৌতুক-ভরা কণ্ঠে বললো, "আর কি আদেশ ?"

"আদেশ ও নির্দেশের পালাই এখন থেকে শুরু হবে ; তার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? আমার এক নম্বরের আদেশ হচ্ছে—তুমি শীগ্‌গীরি মাথা ধুয়ে প্রস্তুত হও। আমাদের আর বিলম্ব করার সময় নেই। এর মধ্যেই আমাদের যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

"যে আজ্ঞা।" বলে বীরেশ এমনভাবে মাথা হেঁট করলো যে শায়লী খিল খিল করে হেসে উঠলো।

বীরেশ দড়ি-বাঁধা কেটলি নিয়ে ধীরে ধীরে নদীর দিকে চললো। শায়লী নিবিষ্ট মনে লঘু হস্তে একের পর এক কাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল তৈরি করে যেতে লাগলো। এক জোড়া বন্য বালিহাঁস তার মাথার উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। শায়লী উদাস দৃষ্টিতে উড্ডীয়মান হংস-মিথুনের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার কাজে মন দিলো। শায়লীর মনে হতে লাগলো—তারাও যেন ওইরূপ মুক্ত আকাশের তলে হংস-মিথুন, নিরুদ্দেশের অভিসারে বের হয়েছে। কবে এবং কোথায় তাদের এই অভিসারের হবে শেষ ? তাদের যাত্রাপথ বিপদমুক্ত থাকবে কি ? শায়লী সহসা শঙ্কিত হয়ে উঠলো।—এই বিশাল পৃথিবীর বুকে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বীরেশকে যদি সে কোনদিন হারিয়ে ফেলে, তবে—? শায়লী আর চিন্তা করতে পারলো না। তার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠলো। একটি মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ওর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এলো। এই বিষাদ-ক্লিষ্ট চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে তাড়াতাড়ি আবার তার কাজে ডুবে যেতে চাইলো কিন্তু তার কর্মনিপুণ লঘু হাত

মুখানি এই প্রচেষ্টায় আগের মত সহযোগিতা করলো না। শায়লী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসে রইলো। তার পর ধীরে ধীরে আবার মশাল তৈরি করতে শুরু করলো, এবং পাহাড়ী সমাজে বিশেষ পরিচিত একটি পুরানো বিরহ গীতি গুণগুণ করে গাইতে লাগলো—

'ও মেরো ময়না
পাহাড় বার আয়ো।
মলায় পিয়ার গড়ায়,
প্রাণ মেরো চোরয়,
কাহা গয়ো, কাহা গয়ো !'

বীরেশ এই গানটি চা বাগানের কুলী মেয়েদের মুখে বহুবার শুনেছে। কিন্তু আজ সেই গানটিই নিভৃত বনভূমে শায়লীর কণ্ঠে মধুময় হয়ে উঠলো। মাথা ধুয়ে নিঃশব্দ চরণে সে শায়লীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালো এবং নিশ্চলের মত একখানি ডাল ধরে শায়লীর গান শুনতে লাগলো।

"শায়লা দাজু ! ও—শায়লা দাজু !" গান শেষ করে হঠাৎ শায়লী চীৎকার করে ডাকলো।

বীরেশ পিছন থেকে হেসে উঠলো। শায়লী ফিরে চেয়ে দেখে—বীরেশ তার পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সে একটু অপ্রতিভ হয়ে সহসা হেসে বললো, "হ্যাঁগা, তুমি কেমন মানুষ ? পরের মেয়ের গান চুরি করে শোন ?"

"আমি আর যেমন মানুষই হই, তোমার পাহাড়ী ময়নার মত পাকা চোর এখনো হতে পারি নি, শায়লী ! চুরি করে বেমালুম পালানোর ক্ষমতা এখনো রপ্ত হয়ে ওঠেনি। তাইতো চুরি করতে এসে হাতে নাতে ধরা পড়ি। তা-ও আবার যে সে চুরি না; যাকে বলে কিনা প্রাণ চুরি—কঠিন কাজ !" বীরেশ ঘাড় বাঁকিয়ে অদ্ভুত চোখের ভঙ্গী করে বললো।

শায়লী আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ও ঠোঁট বাঁকিয়ে চটুল চোখের ভঙ্গিতে বললো, "বটে ? একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির !"

"তা যাই বলো, শায়লী ! তোমার নামকরণ ঠিক হলো না। সত্যবাদী আমি নই; আর যুদ্ধক্ষেত্রে আমি মোটেই স্থির নই, বরং সতত অস্থির। তার প্রমাণ তো গত রাতেই পেয়েছ !" বীরেশ মৃদু হেসে বললো।

"হয়েছে হয়েছে, পণ্ডিত মশাই ! আর পাণ্ডিত্য জাহির করে কাজ নেই,

খুব হয়েছে। এখন পোশাক পরে প্রস্তুত হন। আর আমাদের বিলম্ব করার সময় নেই।" শায়লী কপট রোষে বললো।

বীরেশ বেশ পরিবর্তনের জন্য শাখান্তরে চলে গেল। শায়লী একটি একটি করে মশালগুলি তৈলসিক্ত করে থুঞ্চে দুইটিতে তুলে রাখলো। ইতিমধ্যে বীরেশ বেশ পরিবর্তন করে ফিরে এলো। তারপর চিড়ার বাটি নিয়ে ওরা মুখোমুখি বসে আহার করতে লাগলো।

* * *

বেলা প্রায় এগারটা। শায়লী ও বীরেশ আশ্রয়-বৃক্ষ ছেড়ে আবার পথ ধরলো। ওরা পূর্বের মত রণসাজে পথ চলেছে। শায়লীর এক হাতে শানিত বর্শা, অপর হাতে জ্বলন্ত মশাল। তার অস্ত্রাগারে এটি নতুন আমদানি। বীরেশের এক হাতে কুঠার এবং অপর হাতে একটি মশাল ; প্রয়োজন হলে এটিকে জ্বালানো হবে। নদীটির ধারে ধারে তিন মাইল পথ অতিক্রম করে ওরা একটি ভূপতিত শালবৃক্ষের নিকটে এসে হাজির হলো। গাছটি কোন এক সুদূর অতীতে ঝড়ে উপড়ে পড়লেও এখনো জীবন্ত রয়েছে। সেটি এমনভাবে ভূপতিত হয়েছে যে তার কতকাংশ নির্ঝরিণীর এপারে এবং কতকাংশ ওপারে পড়েছে। আর তার ফলে বনস্পতিটি আপনার দেহ দিয়ে নির্ঝরিণীর উপর একটি নৈসর্গিক সেতু নির্মাণ করেছে। কতদিন হতে যে এই বৃক্ষটি সেতু হয়ে আছে তা বলা কঠিন। তবে এর ভূতলশায়ী গুঁড়ি হতে ইতস্ততঃ দুই একটি ডাল বেরিয়ে আজ সেগুলি বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। শায়লী এর উপর দিয়ে নির্ঝরিণীটি পার হলো। বীরেশ নীরবে শায়লীর অনুগমন করলো।

ভুটান রাজ্যে প্রবেশ করেই শায়লী বললো, "শায়লা দাজু, এবার তোমার মশালটিও জ্বালিয়ে নিতে হবে। কারণ এ জায়গা থেকে তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল পথ আমরা এমন অরণ্যের ভেতর দিয়ে যাব, যাকে সোজা কথায় ভালুকের দেশ বলা যেতে পারে। এই পথে দুই একজন পথিকের পথ চলা নিরাপদ নয়। তাই পথ নির্বিঘ্ন করার জন্য মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছি। জানোয়ারগুলো যতই হিংস্র হোক না কেন, আগুন দেখে ওরা বড় ভয় পায়।"

শায়লীর কথা শুনে বীরেশের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। সে তার মশালটি শায়লীর মশাল হতে ধরিয়ে নিলো। শায়লী ওর দগ্ধপ্রায় মশালটি ফেলে দিয়ে থুঞ্চে থেকে আবার দুইটি নূতন মশাল বের করলো এবং একসাথে জোড়া মশাল জ্বালিয়ে সে পথ চলতে লাগলো।

ভুটানের পথ যেমন বন্ধুর তেমনি দুর্গম। এর তিন মাইল পথ অতিক্রম

করতে নয় মাইলের শ্রান্তি দেহ মনকে বিবশ করে ফেলে। পথ চলতে চলতে শায়লী একটি পথের বাঁকে এসে থমকে দাঁড়ালো।

বীরেশ অস্ফুট কণ্ঠে বললো, "কি ?"

"দেখছো না, কি ভীষণ মৌমাছি উড়ছে !" শায়লী ফিস্ ফিস্ করে বললো।

সে বীরেশের জবাবের অপেক্ষা না করে পথের পাশে তার থুঞ্চেটি রেখে উঁকি ঝুঁকি মেরে চারিদিক দেখতে লাগলো। তারপর হাসিমুখে সে আঙুল দিয়ে অদূরবর্তী একটি গাছের দিকে বীরেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

বীরেশ বিস্ফারিত নেত্রে দেখলো—বৃক্ষের শাখায় বসে একটি ভালুক। তার লোমশ দেহ ক্রুদ্ধ সজারুর মত ফুলে উঠেছে।

জানোয়ারটা তার শূকরের মত মুখটি মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়ে স্তন্যপায়ী শিশুর মত মধুপান করছে। আর চারিদিক হতে মৌমাছিগুলি তার লোমশ দেহের উপর পড়ে তাকে হুল ফুটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বীরেশ ভীত কণ্ঠে বললো, "ভালুক !"

মুখের উপর আঙুল রেখে শায়লী অস্ফুট স্বরে বললো "চুপ !" তারপর বীরেশকে সাহায্য করার ইঙ্গিত করে ক্ষিপ্রহস্তে থুঞ্চেটি পিঠে তুলে সে আবার চলতে লাগলো।

চলতে চলতে ক্রমে বীরেশ ও শায়লী এমন এক বনভূমির ভিতর এসে পড়লো, যার বনশ্রী পথিকের নয়নে একটা বিহ্বল আবেশ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির এই নগ্ন নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করলে ভয়-বিস্ময়-ভরা পুলকে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিহঙ্গের মৃদু কাকলি, নির্ঝরের কলগান, কুসুমিত কাননের মৃদু সৌরভ, শঙ্কা-সঙ্কুল বনমর্মর সৌন্দর্য-রস-পিপাসু পথিকের চিত্তকে যেন উন্মনা করে তোলে। বীরেশ তৃষ্ণার্ত ও ত্রস্ত নয়নে চারিদিক দেখতে দেখতে চলতে লাগলো।

হঠাৎ শায়লী পিছন ফিরে দেখলো—বীরেশ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। সে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকতে লাগলো।

বীরেশ কাছে এসে ক্লান্ত স্বরে বললো, "শায়লী একটু থাম। একটু নেশা না করলে আমি আর পথ চলতে পারছি নে।"

শায়লী মৃদু হেসে অনুনয়ের সুরে বললো, "আর একটু শায়লা দাজু! এই প্রায় এসে পড়েছি—মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ওই চূড়াটায় গিয়েই আমরা থামবো। পাহাড়ে পর্বতে উঁচু স্থান থাকতে, নীচু জায়গায় বিশ্রাম করা সব সময় নিরাপদ নয়।"

বীরেশকে আর প্রত্যুত্তরের সুযোগ না দিয়ে শায়লী প্রায় তাকে হাত ধরে

টানতে টানতে নিয়ে চললো। গিরিশৃঙ্গের উপরে উঠে সে হাঁফ ছেড়ে থামলো। তারপর বীরেশের দিকে চেয়ে বললো, "কিন্তু পাঁচ মিনিট। এর বেশী নয়।"

বীরেশ হাসতে হাসতে পিঠের বোঝা নামিয়ে বললো, "যে আজ্ঞে!" তারপর পকেট হতে একটি বিড়ি বের করে সেটি ধরালো।

শায়লীও বিলম্ব না করে থুঞ্চিটি পিঠ হতে নামালো। এবং একজোড়া নতুন মশাল জ্বালিয়ে বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে বল্লমখানি দৃঢ়ভাবে ধরলো।

এক হস্তে জ্বলন্ত মশাল, অপর হস্তে শানিত বর্শা, মাথায় রঙিন মুক্তোবাঁধা—শায়লী পর্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। বীরেশ বারেক শায়লীর দিকে চেয়ে জ্বলন্ত বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে হেসে বললো, "কি গো! শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য স্বয়ং চণ্ডিকা কি ধরাধামে আবির্ভূতা হলেন?"

"শুম্ভের হদিস তো এখনো পাওয়া যায়নি। তবে কপাল গুণে শম্ভু-শম্ভুনী বধ হয়ে যেতে পারে।" বীরেশের দিকে আড়চোখে চেয়ে শায়লী মৃদু হাসলো।

বীরেশের মুখমণ্ডলে হাসির রেখা ফুটতে না ফুটতেই শায়লী সহসা অঙ্গুলি নির্দেশে পর্বতের পাদদেশে একটি গুহা বীরেশকে দেখিয়ে দিলো। বীরেশের মুখের হাসি দেখতে না দেখতে উবে গেল। সে পূর্বের ন্যায় নির্নিমেষ চোখে দেখতে লাগলো—একটি ভালুক ও একটি ভল্লুকী তাদের ছোট বড় কয়েকটি শাবক নিয়ে পর্বত-শৃঙ্গের তলদেশে একটি গুহার সম্মুখে খেলা করছে!

শায়লী বীরেশকে আশ্বস্ত করে বললো "ভয় নেই, শায়লা দাদু! আমাদের ওরা আক্রমণ করবে না। তবু এখানে দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

শায়লী ও বীরেশ পরস্পরের সহযোগিতায় থুঞ্চে পিঠে তুলে নিলো। তারপর শায়লী তার জ্বলন্ত মশালজোড়া বীরেশের হাতে দিয়ে, বীরেশের জন্য বের-করা মশাল দুইটি জ্বালিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো। বীরেশের বাম হাতে জোড়া জ্বলন্ত মশাল, ডান হাতে ধারালো কুঠার। আর শায়লীর দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ বল্লম, বাম হস্তে জোড়া মশাল। ওরা পথ চলতে লাগলো।

একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে পথ চলছে ওরা। হঠাৎ একটা কিছুর পতন-শব্দে শায়লী থমকে দাঁড়ালো। তার পিছনে বীরেশ—আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ভয়-বিচলিত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলো। ক্ষণেক পরেই একটি ভালুক ধূলি-ধূসরিত গা ঝাড়া দিয়ে পথের উপর উঠে এলো। জানোয়ারটি ওদের জ্বলন্ত মশালের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সহসা গভীর অরণ্যে ছুটে পালালো।

শায়লী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "বাঁচা গেল!"

তারপর বীরেশের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো, "জংলী নাট্যের এ দৃশ্য কেমন লাগলো, শায়লা দাজু?"

"অতি উত্তম—একেবারে জীবন্ত টকি!" বীরেশ অতি কষ্টে ঠোঁটের প্রান্তে কাষ্ঠ হাসির রেখা ফুটিয়ে বললো।

এই বিপদসঙ্কুল পথে বাক্যব্যয় অসমীচীন; তাই জবাব না দিয়ে শায়লী দ্রুত পথ চলতে লাগলো। আবার ওরা উপত্যকা পেরিয়ে এক গিরিচূড়ায় এসে উপস্থিত হলো। শায়লী ওর পিঠের বোঝা মাটিতে রেখে বললো, "শায়লা জু, তোমাকে আবার একটা বিড়ি টানার সময় দেওয়া গেল। কাজটি তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো। আমি ততক্ষণ আমার কাজগুলিও সেরে ন।"

বীরেশও তাই চাইছিলো। সে স্মিত মুখে পিঠ হতে তার থুঞ্চেটি পথপ্রান্তে রাখলো এবং পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে মশালে ধরিয়ে সেটি সজোরে টানতে লাগলো। শায়লী আবার ওর থুঞ্চে হতে মশাল বের করে মশাল দুইটি প্রজ্বলিত করলো এবং সেই প্রজ্বলিত মশাল বাম হাতে ধরে চতুর্দিক সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। এক-একটি পর্বত শৃঙ্গে উঠেই শায়লীর নূতন করে চারদিক দেখবার কাজ আরম্ভ হয়। এক একটি গিরি-চূড়া যেন ওর এক একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

শায়লী সহসা বললো, "ওই দেখ, শায়লা দাজু! চিত্রগুপ্তের খাতায় আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হলো।"

মশালের অগ্রভাগ দিয়ে শায়লী বীরেশকে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশ দেখিয়ে দিলো। বীরেশ দেখলো—একটি বৃহদাকার বাঘ একটি বন্য মহিষ বধ করে তার রক্ত পান করছে।

বীরেশ ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—"সর্বনাশ! শায়লী, এযে Royal Bengal tiger!"

শায়লী তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, "ভয় নেই, শায়লা দাজু! শার্দুলরাজ এখন বিরাট ভোজনে ব্যস্ত। আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণী তার এখন চোখেই পড়বে না। তারপর আমরা যে-পথে যাব সে-পথে ব্যাঘ্ররাজের সাথে দেখা হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

তবু বীরেশের বিচলিত ভাব দূর হলো না। সে অস্ফুট স্বরে বললো, "শেষ পর্যন্ত যথাস্থানে পৌছান যাবে তো?"

"যাঁর নাম নিয়ে বেরিয়েছি; যদি সেই ভগবান বুদ্ধের কৃপা থাকে, তবে অবশ্যই যথস্থানে পৌছাব।" বলে শায়লী দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো। তারপর

সে থুঙ্কেটি ধরে বীরেশকে সাহায্য করতে ইঙ্গিত করলো। বীরেশ থুঙ্কেটি ধরে শায়লীর পিঠে তুলে দিলো। শায়লীও বিলম্ব না করে বীরেশের থুঙ্কেটি তার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজের হাতের জলন্ত মশালজোড়া বীরেশের হাতে দিলো। এবং বীরেশের থুঙ্কে হতে নতুন এক জোড়া মশাল বের করে সে মশাল দুটি জ্বালিয়ে নিলো। ওরা গিরি-গাত্র বেয়ে গিরি-চূড়া হতে নামতে লাগলো। ধীরে ধীরে একটি পাহাড়ী নদ'র তীরে এসে ওরা দাঁড়ালো। উপলখণ্ডে ভরে রয়েছে তার বুক। তার ভিতর দিয়ে হাঁটু-গভীর খরস্রোত জলধারা প্রবাহিত।

শায়লীকে আগের চেয়ে কিছু প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো। সে মৃদু হেসে বললো, "শায়লা দাজু, এই নদীটি পার হলেই আমরা ভালুকের দেশ পেরিয়ে যাব। এর পর গাছপালাবিরল বনভূমি প্রায় মাইলখানেক। তারপর থেকেই শুরু হবে দু-একটি করে ভূটানী বস্তি। এই ভালুকের দেশটি ভূটান গভর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ফরেস্ট।"

বীরেশ উৎফুল্ল হয়ে বললো, "আঃ বাঁচালে, শায়লী! তোমার ভালুকের দেশ একেবারে প্রাণ কণ্ঠাগত করে তুলেছিলো।"

বীরেশ ও শায়লী অতি সন্তর্পণে গিরিনদীটি পার হয়ে ধীরে ধীরে একটি স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট এসে থামলো। শায়লী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পিঠের থুঙ্কেটি মাটিতে নামালো। বীরেশও শায়লীর দেখাদেখি তার থুঙ্কেটি মাটিতে রেখে একটি বিড়ি ধরাবার উপক্রম করলো।

শায়লী বেদনা-মন্থর কণ্ঠে বলতে লাগলো, "শায়লা দাজু, এই যে প্রস্তরস্তূপ দেখছো, এটা হলো 'মান্থু-মায়লীর মানে'*। এর এক করুণ ইতিহাস আছে, যা শুনতে শুনতে চোখ অশ্রু-সজল হয়ে আসে।

"মান্থু অর্থাৎ মন বাহাদুর; সে ছিল পাশের গুম্বার† একজন গালুং+। আর মায়লী হলো ওই গুম্বারই কাছাকাছি একটি গ্রামের মণ্ডলের দ্বিতীয়া কন্যা। নেপালী ভাষায় দ্বিতীয় কন্যাকে মায়লী বলে, তা তুমিও জানো। এই গালুং সঙ্ঘের বিধি লঙ্ঘন করে মায়লীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে। সরলা মায়লীও প্রেমের জবাব প্রেম দিয়েই দিলো। তারপর যা হবার, অর্থাৎ শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে যা হয় তাই হলো। একদিন গভীর রাতে মান্থু ও মায়লী নিরুদ্দেশ হলো। ক্রুদ্ধ প্রধান লামা রাজদরবারে বিচার প্রার্থনা করলেন। ভূটান রাজ্যে লামারা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যের শাসকরাও লামাদের যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করে থাকেন। এ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে লামারা জনগণ-মন-অধিনায়ক। তাঁরা হুঙ্কার দিলে রাজাসন ভূলুণ্ঠিত হতে বেশী সময় লাগে না। তাই, লামারা যার বিরুদ্ধে নালিশ করেন, সেই

বাংলা—*স্মৃতি-স্তূপ। †মঠ। +অল্পবয়স্ক যুবক লামা।

হতভাগ্যের অনেক সময় লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে থাকে। ভুটান সীমান্ত পার হবার আগেই মাম্নু ও মায়লী ধরা পড়ে। কাজীর বিচারে মাম্নুর হয় মৃত্যুদণ্ড এবং মায়লীকে তার বাপ মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডের পর গুম্বাধিপতির নির্দেশে মাম্নুকে এইখানে কবর দেওয়া হয়। তোমাদের বাংলা ভাষায় নাকি একটা কথা আছে—'হাত বাঁধবে পা বাঁধবে কিন্তু মন বাঁধবে কে?' কয়েকদিন পর আবার গ্রামে হৈ হৈ রব উঠলো যে, মায়লী আবার পালিয়েছে। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল—মায়লীর শোনিত-স্নাত মৃতদেহ মাম্নুর কবরের উপর পড়ে রয়েছে। কবরের উপর দিয়ে রক্তের ঢল বয়ে যাচ্ছে। হতভাগিনী ধারালো খুঁকরী দিয়ে পেটে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর পরেও অভাগিনীর হাতে রক্তাক্ত ভুজালীখানি মুষ্টিবদ্ধই ছিলো। খবর পেয়ে ছুটে এলো ভুটানের পুলিস, ছুটে এলেন গুম্বাধিপতি প্রধান লামা

এলেন ভুটান রাজ্যের এ অঞ্চলের দেওয়ান যাঁর কুঠি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। পুলিস তার দেহ অনুসন্ধান করে পেল এক টুকরো কাগজ; তাতে ভুটানী ভাষায় লেখা ছিল, 'মাম্নু, আমিও আসছি।' অহিংসার পূজারী বৃদ্ধ লামা এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য তিনি অনুশোচনা করতে লাগলেন। তাঁর দু গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত জনতা, দেওয়ান—সকলেই স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। কারো মুখ থেকে একটি কথাও বের হলো না।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ লামা স্বহস্তে মৃতার সদ্গতির জন্য যথাকর্তব্য শেষ করে মাম্নুর কবরের পাশেই মায়লীকে সমাধিস্থ করলেন। গুম্বাধিপতির চেষ্টায়ই এই মানে মাম্নু ও মায়লীর কবরের উপর নির্মিত হয়েছিলো। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতি বৎসর এদের মৃত্যুদিনে এই স্মৃতি স্তূপের বেদীমূলে বসে নিজে ত্রিপিটক পাঠ করে এই ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকার আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করতেন। এখনো এই দিন দুইটি উপলক্ষে এখানে দূর দূরান্তর হতে কত লোক আসে; যার ফলে, তখন এখানে ছোটখাটো মেলা বসে যায়। পূর্ব রীতি অনুসারে এখনো এখানে যিনি গুম্বাধিপতি থাকেন, তিনিই এসে ঐ দিনদুটিতে এখানে ত্রিপিটক পাঠ করে থাকেন।"

শায়লী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে থামলো। বীরেশ নীরবে নিবিষ্ট চিত্তে বসে শায়লীর কথাগুলি যেন গিলছিলো। সে বিড়িতে একটি টান দিয়ে অর্ধদগ্ধ অংশটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। শায়লী ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বললো, "শায়লা দাজু! চা খাবে?"

"অমৃতে অরুচি কবে ?" বীরেশ মন্থর কণ্ঠে বললো।

"ভুটানের পাহাড়ে চা অমৃতই বটে। তবে উঠ শীগ্গীরি। এই বটগাছের নীচে বসে গল্প না করে গাছে উঠেই চা পান করা যাক। যদিও আমরা ভালুকের দেশ পেরিয়ে এসেছি, তবু যতটা সাবধান থাকা যায় ততই মঙ্গল!" বলতে বলতে শায়লী থুক্কে হতে চা-এর ফ্লাস্কটি এবং টিফিন কেরিয়ারের একটি বাটি নিয়ে গাছে উঠতে লাগলো। বীরেশ বাক্যব্যয় না করে শায়লীর অনুসরণ করলো।

গাছে উঠে শায়লী ও বীরেশ মুখোমুখি বসে চা পান করতে লাগলো।

"শায়লা দাজু! তোমাদের বাংলাদেশের নরনারী যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে থাকে রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমের গাথা, তেমনি কিংবা তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে থাকে ভুটানীরা মায়লী-মানুর প্রেমের কাহিনী।"

বীরেশ ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা চা পান করে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মানু-মায়লীর স্মৃতিস্তম্ভের দিকে। অতি সাধারণভাবে তৈরী এই মানে। কাদামাটি দিয়ে পাথরখণ্ডের উপর পাথরখণ্ড বসিয়ে গাঁথা এই স্তূপ। মানের শীর্ষদেশে প্রস্তরখণ্ডে খোদাইকরা ভগবান তথাগতের একটি মূর্তি গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এই মূর্তিটি বিলক্ষণ ভুটান ভাস্কর্যের নিদর্শন। প্রস্তরখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে উদ্‌গত নিবিড় দুর্বাদল সৃষ্টি করেছে একটি কোমল শ্যাম আস্তরণ এই স্মৃতিস্তূপের সারা দেহ ভরে, যেথায় এখনো নেমে আসে কত বর্ষার বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, ঝরে পড়ে কত শরতের স্নিগ্ধ শিশির-বিন্দু, হু হু করে আজো বয় বসন্তের অশান্ত বাতাস; আজো রেখে যায় কত নরনারী তাদের নীরব বেদনার অশ্রুবিন্দু।

হঠাৎ টিফিন্ কেরিয়ারের বাটিটির পতন-শব্দে বীরেশের চৈতন্য হলো। সে সচকিতভাবে বললো, "কি, চা পড়ে গেল ?"

"না, আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।" শায়লী বললো।

"তবে এক অপেক্ষা কর, আমি বাকি চাটুকু শেষ করে ফেলি।" বীরেশ ফ্লাস্কটি মুখে লাগিয়ে ঢক্ ঢক্ করে চা পান করতে লাগলো এবং মুহূর্তের মধ্যে পাত্রটি খালি করে ফেললো।

"চল, এখন নীচে নামা যাক্।"—শায়লী বললো।

"চল।" বীরেশ বললো।

বটগাছ থেকে নেমে শায়লী ফ্লাস্ক ও টিফিন কেরিয়ারের বাটিটি থুক্কেতে তুলে রাখলো। ধীরে ধীরে কোমরে জড়ানো পটুকার প্রান্ত খুলে সে একটি কোঁচড় তৈরী

করলো। তার পরে স্মৃতিস্তূপের অদূরের একটি বন্য ফুলগাছের তলা হতে কোঁচড় ভরে ফুল কুড়িয়ে এনে সযত্নে মানেটি সাজাতে লাগলো। স্মৃতি-স্তূপটি সাজাতে সাজাতে শায়লী ধীরে ধীরে গুণগুণ করে গাইতে লাগলো—'মাঙ্গু মেরো মন-চোর··· ।'

এই গানটিও বীরেশ দু-একবার শুনেছে ভুটান-আগত নেপালী কুলী মেয়েদের মুখে। এটি দক্ষিণ ভুটানের একটি বিখ্যাত বিরহ-গীতি। সঙ্গীতনিপুণ কণ্ঠে কুলী-কামিনীদের মুখের একটি মেঠো গান আজ অভিনব মিষ্টিসুরের মূর্ছনায় অপূর্ব লাগতে লাগলো তার কাছে। বীরেশ নীরবে শায়লীর পিছনে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ আবেগে ওর গান শুনতে শুনতে অপলক নেত্রে স্তূপ রচনা দেখতে লাগলো। আবার একটা স্বপ্নাতুর আবেশ বীরেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। অজ্ঞাতে কখন তার চোখ থেকে ঝরে পড়লো কয়েক বিন্দু অশ্রু।

স্তূপ রচনা শেষ না হতেই শায়লীর কোঁচড়ের ফুল ফুরিয়ে গেল। সে আবার ফুল আনতে গেল। বীরেশ নীরবে স্মৃতি-স্তূপটির দিকে চেয়ে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ কেন জানি তার মনে হলো—তারই বা মাঙ্গুর দশা হতে কতক্ষণ? কারণ সে বিদেশী, তাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা মোটেই বিচিত্র নয়। তারপর সে একজন বিদেশী হয়ে একটি পাহাড়ী মেয়েকে অনুসরণ করে সেই পাহাড়েই এসে হাজির হয়েছে, একটি পাহাড়ী মেয়েকে ভালবাসার অপরাধে যেখানে মাঙ্গুর হয়েছিল প্রাণদণ্ড! যদি ঘুণাক্ষরেও তার স্বরূপ প্রকাশ পায় তবে ভুটানীরা তাকে কি চক্ষে দেখবে? আত্মগোপনকারীকে নিশ্চয়ই এ-দেশবাসী কিংবা এই রাষ্ট্র—কেউই ক্ষমা করবে না। গুপ্তচরের প্রাণদণ্ডের বিধান তো অনেক দেশেই আছে। সে-ই বা কতদিন সতর্ক প্রহরীর মত নিজেকে পাহারা দিয়ে চলতে পারবে?

শায়লী তখনও আপন মনে ফুল কুড়িয়ে চলছে।

বীরেশ ডাকলো, "শায়লী।"

শায়লী ফুল কুড়াতে কুড়াতে বললো, "বলো।"

"আমারও তো মাঙ্গুর দশা হতে পারে, শায়লী?"—

শায়লী এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বীরেশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, "কী বললে?"

"বললাম—আমারও তো মাঙ্গুর মত প্রাণদণ্ড হতে পারে?" বীরেশ আবার বললো:

সহসা ফুল সমেত কোঁচড়ের প্রান্তটি শায়লীর হাত থেকে খসে পড়লো। ঝরঝর করে ফুলগুলি ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে। একটা সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় শায়লীর চোখ মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। ওর শরীর তখন ঈষৎ কাঁপছে

শায়লীর এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তর দেখে বীরেশ আমতা-আমতা করে বললো. "শায়লী, বলছিলাম কী—আমি বিদেশী, ধরা পড়লে মৃত্যু··· ।"

বীরেশের কথা শেষ না হতেই শায়লী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, "না না না।"

বাধা পেয়ে বীরেশ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

শায়লী দু হাতে চোখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগলো, "শায়লা দাজু, এর চেয়ে কম শাস্তি কি ছিল না তোমার তূণে? কেন তুমি এমনিভাবে আঘাত দিলে আমাকে ?"

"আমি অতটা ভেবে বলিনি, শায়লী! আমি ভাবছিলাম—আমার মত একজন বিদেশী নিঃসম্পর্ক যুবক তোমার মত একটি কুমারী মেয়ের সাথে থাকলে তোমারও তো কোন বিপদ হতে পারে?" বীরেশ অপরাধীর মত কথাটা একটু ঘুরিয়ে অস্ফুটস্বরে বললো।

শায়লী রোরুদ্যমান কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো, "না, তুমি বিদেশী নও—নিঃসম্পর্ক নও, তুমি পাহাড়ী—তুমি নেপালী। তুমি তুমি তুমি শায়লীর······ " এর পর আর উপযুক্ত কোন শব্দ সহসা খুঁজে না পেয়ে শায়লী তীব্র উত্তেজনায় থেমে গেল।

বীরেশ নির্বাক—নিস্পন্দ। শায়লী চোখ দুটি দু হাতে ঢেকে তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বিমুগ্ধ চোখে বীরেশ নীরবে চেয়ে রইলো তার দিকে। আজ সে তার মধ্যে বাঙ্গালীর গৃহকোণের এক সেবানিরতা প্রতীক্ষমানা বধূকে যেন দেখতে পেল; এতদিনে তার স্বপ্নসঙ্গিনী যেন রূপায়িত হয়েছে শায়লীর মাঝে। অনুরাগ-সংসক্ত পুলকে বীরেশের দেহ রোমাঞ্চিত হলো। তার অঙ্গে অঙ্গে শিরায় শিরায় উচ্ছল হয়ে উঠলো জীবন-রস-সঞ্চারী নিগূঢ় আবেগ। মন্থর পদে বীরেশ শায়লীর কাছে এগিয়ে গেল, ওকে বাহুবদ্ধ করে সোহাগভরা কণ্ঠে ডাকলো, "শায়লী!"

শায়লীর কান্নার বেগ তখন প্রায় প্রশমিত হয়ে এসেছে।

একটা স্পর্শকাতর আবেশে শায়লী চোখ মেললো, অবাক হয়ে দেখলো —এতদিনে শঙ্করের যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। ধীরে ধীরে বীরেশের স্পর্শাতুর

অধর শায়লীর অধরে নেমে এলো। শায়লী মৃদু হেসে চোখ বুজলো। তার শিথিল দেহ ধীরে ধীরে সুখ-তন্দ্রায় ডুবে যেতে লাগলো। ঝুর ঝুর করে কতকগুলি ফুল তাদের মাথায় ঝরে পড়লো হঠাৎ।

বীরেশ সকৌতুকে বললো, "শায়লী, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছেন।"

শায়লী ঊর্ধ্বে চেয়ে দেখলো—ইতিমধ্যে গুটিকয়েক বন্য বানর ফুল গাছটায় এসে ছুটাছুটি শুরু করেছে।

সে হেসে বললো, "দেবতা নয় দেবানুচর।"

দশ

মান্থ-মায়নীর 'মানে' হতে শায়লী ও বীরেশ যখন আবার পথে এসে নামলো তখন বেলা প্রায় চারটা। শায়লী চলছে। আনন্দের প্রাচুর্যে পূর্ণ কেমন যেন একটা উচ্ছল ভাব ওর সারা অঙ্গে ছেয়ে রয়েছে এখন।

কিছুদূর পথ চলার পর বীরেশ বললো, "শায়লী, মশাল ধরালে না?"

"প্রয়োজন হবে না। আর মাইল খানেক পথ কোন প্রকারে পার হয়ে যাব। তাছাড়া, বিপদের জায়গা তো পার হয়েই এসেছি। আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাব তরল বনের মাঝে মাঝে বস্তিওয়ালাদের দু-একটি করে কমলা লেবুর বাগান এবং ওই বাগানের পাহারায় নিযুক্ত তীর ধনুক হাতে দু-একটি করে ভুটিয়া যুবক।" শায়লী বললো। চোখে মুখে তার নির্ভয়ের ভাব।

শায়লী শঙ্কাহীন চিত্তে পথ চলতে লাগলো। তার এই নির্ভিকতায় অন্তরীক্ষে বসে বুঝি নিষ্ঠুর নিয়তি হাসলেন। তার কথা শেষ হতে না হতেই সামনে একটি পথের বাঁক দেখা গেল। বাঁকটি অতিক্রম করেই সে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলো, "এই সেরেছে!"

বীরেশ ভীতি-বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখলো—তীরবিদ্ধ ক্ষিপ্তপ্রায় একটি বিরাটকায় ভল্লুক তাদের দিকে ছুটে আসছে।

"শায়লা দাজু, সাবধান!" বলে শায়লী হস্তস্থিত বর্শাটি খুব শক্ত করে ধরে আক্রমণের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। জানোয়ারটি নিকটে আসামাত্র দু পা তুলে শায়লীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। শায়লী ক্ষিপ্রহস্তে তার বর্শাটি সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলো। ক্রুদ্ধ ভল্লুকটি ভীষণ গর্জন করে সম্মুখে উত্তোলিত পায়ের সাহায্যে বর্শাটি প্রাণপণে কামড়ে ধরলো।

"শায়লা দাজু! শীগ্গীর তোমার হাতের কুড়ুলটা দিয়ে জানোয়ারটার পেটে আঘাত কর। আঘাত কর বলছি—শীগ্গীর।" শায়লী চীৎকার করে উঠলো।

বীরেশ আঘাত করার উপক্রম করতেই তার কম্পমান হাত থেকে উত্তোলিত কুড়ালটি পড়ে গেল। বুদ্ধিমতী ও দুঃসাহসী শায়লীর বুঝতে বিলম্ব হলো না—ভয়াতুর বীরেশকে এই কাজ করতে দিলে তার পরিণতি কি হবে।

"শায়লা দাজু! ছেড়ে দাও। তোমার কুড়ুল কুড়ানোর দরকার নেই। তুমি তাড়াতাড়ি আমার হাতের বর্শাটা আমার মত দু-হাতে এমনি করে উঁচু করে ধর। —ধর বলছি ধর!" শায়লী আবার চীৎকার করে উঠলো।

বীরেশ কম্পিত হস্তে শায়লীর নির্দেশ পালন করলো।

দেখতে দেখতে কোষমুক্ত ভুজালীখানি শায়লীর হাতে ঝলসে উঠলো। মরিয়া হয়ে শায়লী ওর সর্বশক্তি দিয়ে পশুটির বিশাল পেটে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটার আহত পেট থেকে নাড়িভুঁড়িগুলো বেরিয়ে পড়লো। বুক-ফাঁটা আর্তনাদে ভল্লুকটি ধরাশায়ী হলো। ওর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ে পাহাড়ের রাঙা মাটি আরো রাঙা হয়ে উঠলো। পশুটির করুণ আর্তনাদ অপরাহ্ণের অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার একটা শোকক্লিষ্ট বিহ্বলতা সৃষ্টি করলো।

শায়লী শোনিতাক্ত খুঁকরীখানি হাতে করে স্তব্ধভাবে স্থির দৃষ্টিতে রুধিরসিক্ত জন্তুটার দিকে চেয়ে রইলো। পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললো, "শায়লা দাজু! ঠিকই বলেছ—মৃত্যু যেন আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছে। চল শীগ্‌গীরি, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা হবে না। পশুটার চীৎকার শুনে ওর জাত ভাইরা এখানে এসে জড় হতে পারে।"

শায়লী ও বীরেশ সম্মুখের আঁকাবাঁকা পথে ছুটে চলতে লাগলো। শীগ্‌গীরি তারা একটি নদী পার হয়ে নাতিবৃহৎ একটি উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলো। উপত্যকাটির দক্ষিণাংশের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে ছোট বড় কমলালেবুর বাগান। এই বাগানগুলির ভেতর দিয়ে শায়লী ও বীরেশ ক্রমে একটি ভুটিয়া পল্লীতে প্রবেশ করলো। শায়লী ধীরে ধীরে একটি কুটিরের সম্মুখে এসে ডাকলো, "মাসী!"

ডাক শোনা মাত্র একজন বৃদ্ধা নেপালী মহিলা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি ক্ষণকাল বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে শায়লীর দিকে চেয়ে থেকে বললেন "শায়লী?"

"হাঁ মাসী!" শায়লী মৃদু হেসে উত্তর করলো।

মাসী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে শায়লীর হাত ধরলেন এবং তার পিঠ থেকে খুক্কেটি নামিয়ে ঘরের বারান্দায় রাখলেন। তারপর হাসতে হাসতে মাসী বললেন, "বেটী, এ তোমার কি সাজ? পুরুষের বেশ আধখানা দেহে, হাতে বর্শা—এ বেশে তোমাকে দেখে আমার প্রথম একটু ধোঁকাই লেগেছিলো।"

"কি আর করি বলো? তোমাদের যা জংলা দেশ, মাসী! এখানে আর কি শাড়ী পরে পথ চলা যায়? তারপর এ দেশের পথে পথে যা বাঘ ভালুকের উৎপাত! —এই দেখো-না।" শায়লী মৃদু হেসে ভীষণভাবে দাঁতে-কামড়ানো বর্শাখানা ও

রক্তাক্ত খুঁকরীটি বের করে দেখালো। সব শুনে আজন্ম অরণ্যে পালিতা এই নেপালী রমণীও ভয়ে নির্বাক হয়ে রইলেন।

ক্ষণেক নীরব থেকে মাসী বললেন, "ও পথে কেন এলে, বেটী? আমাদের সরকার তোমাদের দেশে যাবার জন্য প্রায় এক বৎসর হলো ভাল রাস্তা তৈরী করেছেন। তাই আজকাল ও পথে আমরা কেউ যাইনে।"

"আমরা কি আগে জানতাম ছাই।" শায়লী স্মিত মুখে বললো।

"ইনি কে, শায়লী?" এতক্ষণে বীরেশের দিকে চেয়ে মাসী বললেন। শায়লী ক্ষণকাল লজ্জা-রাঙা মুখে মাথা নীচু করে রইলো; পরে কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বললো, "তোমাদের জামাত্, মাসী!"

বীরেশ শায়লীর নির্দেশের পূর্বেই পিঠ থেকে থুঞ্চেটি মাটিতে নামিয়ে নির্লিপ্তের মত দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ শায়লীর এই কথা শোনামাত্র তার চোখ মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। মাসী তৎক্ষণাৎ বীরেশের হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে গেলেন এবং পশুর লোমাবৃত একটী ভুটানী আরাম কেদারায় বীরেশকে বসিয়ে হেসে বললেন, "এখানে একটু বস, বেটা! আমি তোমাদের জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"

শায়লী বাধা দিয়ে বললো, "দরকার নেই, মাসী। আমাদের সঙ্গেই তৈরী চা আছে। তাছ'ড়া কিছুক্ষণ আগেই আমরা চা খেয়েছি।"

"এই বনে জঙ্গলে চা কোথায় খেলে? আর তৈরী করে চা-ই বা তোমাদের কে দিলো?" মাসী শায়লীর দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের হাসি

"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না, মাসী? আচ্ছা।" শায়লী মৃদু হেসে চায়ের ফ্লাস্কটি বের করে তার মুখ খুলে মাসীকে দেখালো।

"তোমরা আজকালকার মেয়েরা এত বুদ্ধিও র.খ সারা সংসারটা একেবারে মাথায় করে বেরিয়েছ!" মাস মৃদু হেসে বললেন।

"তোমাদের এদেশে সংসার মাথায় করে না এলে পথে না খেয়ে শুকিয়ে যে মরতে হবে।" শায়লী হেসে বললো।

তারপর সে থুঞ্চে থেকে শাড়ী, সেমিজ, সাবান ইত্যাদি স্নানের উপকরণ হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলো এবং ঘর হতে টুকরিতে-ভরা জল আনার কলসীটি পিঠে তুলে বের হয়ে এলো।

"ছিঃ ছিঃ শায়লী, তুমি কেন জল আনতে যাচ্ছ? দাও কলসী। আমি যাচ্ছি।" মাসী শায়লীর পিঠ থেকে কলসীটি নেবার চেষ্টা করলেন।

"বাঃ, তোমার বেশ কথা, মাসী! মেয়ে থাকতে বুড়ী মা যাবে জল আনতে, না?" শায়লী ঘোর আপত্তি করে দাঁড়ালো।

"ভাল কথা—দাদা-বৌদি কোথায়? ওদের তো দেখছিনে।" সে জিজ্ঞাসা করলো।

"ছেলে, বৌ তোমাদের আসার একটু আগে ওই পাহাড়ের ধারে গেছে কমলা-লেবু ভাঙতে। ভেবেছিলাম, তোমাদের একটু চা দিয়েই আমি ওদের ডাকতে যাব।" —মাসী বললেন।

"ডাকার আর এখন দরকার নেই, মাসী! চল, আমরা এখন একটু ঝরনায় যাই।" শ্যামলী মাসীর হাত ধরে টানতে টানতে ঝরনার দিকে চললো।

পথশ্রান্ত দেহখানি আরাম কেদারায় এলিয়ে দিয়ে বীরেশ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ওই উদাস-করা পথটার দিকে, যে পথ বেয়ে সে আজ এই অজানা রহস্যময় দেশে এসে উপস্থিত হয়েছে, যে পথে তার পায়ের ছাপ হয়ত আর কখনো পড়বে না। ধীরে ধীরে তার স্মৃতিপটে মা, বোন এবং তাদের ছায়া-সুনিবিড় গ্রামখানি ভেসে উঠে একটা ব্যথাতুর আবেশে তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। সহসা তার বুকটা যেন হুহু করে উঠলো। বীরেশ জড়ের মত পড়ে রইল ইজিচেয়ার খানায়। তার দু চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়লো দু ফোটা অশ্রু।
